নন্দীগ্রামে
মাননীয়ার
পায়ে আঘাতের
চিত্রনাট্য
একেবারেই ফ্লপ
— পৃঃ ২৯

স্বস্তিকা

দাম : বারো টাকা

এবারের নির্বাচন
কতটা অবাধ ও
নিরপেক্ষ হবে
— পৃঃ ২৬

৭৩ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা।। ২২ মার্চ ২০২১।। ৮ চৈত্র - ১৪২৭।। যুগাব্দ ৫১২২ ।। website : www.eswastika.com

দোল সাহিত্য সংখ্যা

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৩ বর্ষ ৩০ সংখ্যা, ৮ চৈত্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

২২ মার্চ - ২০২১, যুগাব্দ - ৫১২২,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সহানুভূতি আদায়ের ব্যর্থ চেষ্টা মুখ্যমন্ত্রীর ▯ বিশ্বামিত্র ▯ ৬

সুন্দর মৌলিকের চিঠি : দিদির 'পা'-মাটি-মানুষ ▯ ৭

পাশ্চাত্যের দেশগুলি কেবলমাত্র নিজেদের স্বার্থই দেখে ▯ কৃষ্ণমূর্তি সুব্রহ্মনিয়াম ▯ ৮

বাঙ্গালির আজকের বর্ণাঢ্য দোলযাত্রার রূপকার শ্রীচৈতন্য এবং রবীন্দ্রনাথ ▯ প্রবাল চক্রবর্তী ▯ ১১

সাহিত্যিক সত্যজিৎ ▯ অভিজিৎ দাশগুপ্ত ▯ ১৩

কবির স্বপ্ন এবং স্বপ্নে পাওয়া কবিতা ▯ মালিনী চট্টোপাধ্যায় ▯ ১৭

মিঠুনকে অপমান করার আগে মানুষটাকে চিনুন ▯ বরুণ মণ্ডল ▯ ১৮

প্রাণের উৎসব, রঙের উৎসব দোল ▯ নন্দলাল ভট্টাচার্য ▯ ২৩

কারুশিল্পের পটভূমিকায় জয়পুরের দুটি নবরত্নের মন্দির ▯ বিপ্লব বরাট ▯ ২৫

এবারের নির্বাচন কতটা অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে ▯ সুকল্প চৌধুরী ▯ ২৬

মাননীয়ার নন্দীগ্রামে পায়ে আঘাতের চিত্রনাট্য একেবারেই ফ্লপ ▯ বিশ্বপ্রিয় দাস ▯ ২৯

গল্প : কিপার ▯ পার্থসারথি গুহ ▯ ৩১

গল্প : উপহার ▯ সিদ্ধার্থ সিংহ ▯ ৩৫

গল্প : চাঁদিয়াল ▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ৩৮

মানীয়ার অনুপ্রেরণায় রাজ্যের কৃষিব্যবস্থা খাদের অতলে ▯ ড. তরুণ মজুমদার ▯ ৪৪

পূর্বাঞ্চলের বনবাসী ভাই-বোনেদের বাঁচাতে হবে ▯ অসীম বিশ্বাস ▯ ৪৭

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ ▯ চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ অঙ্গনা : ২১ ▯ সুস্বাস্থ্য: ২২ ▯ সমাবেশ-সমাচার : ৩০ ▯ নবাঙ্কুর : ৪৮-৪৯ ▯ শব্দরূপ : ৫০

প্রকাশিত হবে
২৯ মার্চ
২০২১

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২৯ মার্চ
২০২১

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

হুইল চেয়ারের নাটক করে সহানুভূতি জুটবে কি?

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পায়ে চোট লেগেছে। প্রথমে তিনি দাবি করেছিলেন এর পিছনে রয়েছে বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর ষড়যন্ত্র। শুভেন্দুর অনুগামীরাই নাকি তাঁকে 'ধাক্কা' মারেন এবং তার ফলে তিনি পায়ে চোট পান। পরে একশো আশি ডিগ্রি ডিগবাজি খেয়ে বললেন, গাড়ির দরজা পায়ের ওপর চেপে যাওয়ায় আঘাত লেগেছে। কোন পায়ে চোট তাই নিয়েও নাটক কম হয়নি। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রথমে দেখানো হয়েছিল ডান পায়ের ছবি। পরে জানা গেল বাঁ পা। যাই হোক, মমতা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, হুইল চেয়ারে বসেই তিনি ভোটের প্রচার করবেন। কেননা, তাঁর আশা হুইল চেয়ারে তাঁকে দেখলে মানুষের সহানুভূতি ভোট তিনি পাবেন।

প্রশ্ন উঠেছে, হুইলচেয়ারের নাটক কি তাহলে সহানুভূতি আদায়ের কৌশল? এই নিয়েই আগামী সংখ্যার স্বস্তিকায় লিখবেন সুজিত রায়, সুন্দর মৌলিক প্রমুখ।

দাম একই থাকছে— মাত্র ১২ টাকা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank Ltd.
Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-700 071**

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

প্রাণের উৎসব মিলনের উৎসব দোল

ভারতীয় উৎসব হইল ভারতীয় সংস্কৃতির শিকড়। উৎসবগুলি প্রমাণ করিতেছে ভারতীয় জাতির প্রাচীনত্ব। উৎসবগুলিই ভারতীয়দের প্রাণবন্ত রাখিয়াছে। এই রকমই একটি প্রাণের উৎসব সংঘটিত হয় বসন্তকালে। বসন্তঋতু প্রাণস্ফুরণের ঋতু। কবি গাহিয়াছেন–'মোর বীণা ওঠে কোন সুরে বাজি, কোন্ নব চঞ্চল ছন্দে। মম অন্তর কম্পিত আজি নিখিলের হৃদয়স্পন্দে।' অন্যত্র আবার গহিয়াছেন–'ওরে আয় রে তবে, মাত রে সবে আনন্দে, আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।' এই নবীন প্রাণের বসন্তেরই একটি উৎসব দোল। ইহা শুধু বাঙ্গালির উৎসব নহে, ইহা সম্পূর্ণ ভারতবর্ষের। কোন ত্রেতাযুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেশিনী অসুরকে বধ করিয়া আনন্দে মাতিয়া উঠিয়া গোপবালক-বালিকাদের সঙ্গে রং খেলায় মাতিয়া উঠিয়াছিলেন, তাহারই স্মরণে ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে রাধা-গোবিন্দের পূজা করিয়া নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আবির-সহ নানান রং খেলায় মাতিয়া উঠিতেছেন।

উৎসব একটি জাতির সংস্কৃতির পরিচায়ক। আদিকাল হইতে তাহা বিভিন্ন রূপে প্রবহমান হইয়া যুগে যুগে জাতিকে প্রাণবন্ত করিয়া রাখে। পুরাণকথা অনুসারে, দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু নিজপুত্র বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদকে পুড়াইয়া মারিবার চক্রান্তে ভগিনী হোলিকাকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রহ্লাদকে অক্ষত রাখিয়া আগুন হোলিকাকেই দহন করিয়া ফেলিয়াছিল। সেই স্মরণেই বসন্তের এই উৎসবটি সমগ্র ভারতবর্ষে হোলি নামে সমধিক পরিচিত । উৎসবের অনুষঙ্গ রূপে দোলুর্ণিমার পূর্বদিন সারা দেশে অশুভ শক্তির বিনাশ কামনায় হোলিকা দহন বা নেড়া পোড়ানো হইয়া থাকে। এইরূপ নানা স্মৃতিবিজড়িত দিনেই বঙ্গপ্রদেশের সিংহপুরুষ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইয়াছে। তিনি কট্টর ইসলামি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালি হিন্দু আজ উৎসবের নেপথ্যের তাৎপর্য ভুলিতে বসিয়াছে।

দোল বা হোলি ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতম উৎসব। বিন্ধ্য অঞ্চলে প্রাপ্ত শিলালিপি হইতে অনুমান করা হয়, খ্রিস্টপূর্ব তিনশত অব্দেও হোলি উৎসবের প্রচলন ছিল। এখনও ভারতের কাশ্মীর হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত আপামর দেশবাসী হোলি উৎসবে মাতিয়া ওঠে। বিভিন্ন রাজ্যে ইহা বিভিন্ন নামে উদ্‌যাপিত হয়। উত্তরাখণ্ডে ইহার নাম খাড়িহোলি। পঞ্জাবে হোলামহল্লা। মণিপুরে ইয়াও সাং। উত্তরপ্রদেশের বৃহদংশে লাঠমার। রাজস্থানে রাজকীয় হোলি। অসমে ফাকুওয়া। বিহারে ফাগুয়া। মহারাষ্ট্রে ও মধ্যভারতে রং পঞ্চমী। গোয়ায় সিগ্‌মো। কেরলে মাঞ্জালাকুলি। হরিয়ানাতে দুলুন্দি। ভারতবর্ষের বাহিরে শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, ত্রিনিদাদ, টোবাগো, সুরিনাম, ফিজি, গায়ানা, মালেশিয়াতে হোলি উৎসবের প্রচলন রহিয়াছে। ইস্‌কনের কল্যাণে ইউরোপ-আমেরিকায় হরিনাম সংকীর্তন সহ এই উৎসব ব্যাপক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এক কথায়, এই উৎসবের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতির বিশ্বসঞ্চার ঘটিয়াছে।

দোল বা হোলি উৎসব দেশে দেশে বা অঞ্চল ভেদে বিশেষ বিশেষ নামে পালিত হইলেও প্রাণের আনন্দ, মিলনের আনন্দ সমস্ত স্থানেই একই রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ-সহ কয়েকটি রাজ্যে এই মহতী উৎসবের আবহেই নির্বাচনের বাজনা বাজিয়া উঠিয়াছে। সবাইকে স্মরণ রাখিতে হইবে, ভারতবর্ষের আনন্দ ও মিলনের উৎসবকে যেন নির্বাচনের হানাহানি কলুষিত করিতে না পারে।

সুভাষিতম্

গচ্ছতস্তিষ্ঠতো বাপি জাগ্রতঃ স্বপতোঽপি বা।

ন বিচারপরং চেতো যস্যাসৌ মৃত উচ্চতে।।

যে ব্যক্তির মন চলতে চলতে, অবস্থান করতে করতে, জাগ্রত অবস্থায়, এমনকী স্বপ্নাবস্থাতেও বিচারশীল নয়, বিদ্বজ্জনেরা তাকে মৃত বলে মনে করেন।

সহানুভূতি আদায়ের ব্যর্থ চেষ্টা মুখ্যমন্ত্রীর

বিশ্বামিত্র

গত সপ্তাহে রাজ্য-রাজনীতিতে তোলপাড় ফেলেছিল যে ঘটনাটি তাহলো নন্দীগ্রামে ভোটপ্রচারে গিয়ে মমতা ব্যানার্জির আহত হওয়া। তাঁর পায়ের গোছ ফলে যাওয়া, আঘাতের চিহ্ন নিমেষে ভাইরালও হয়েছিল। প্রথমে তিনি অভিযোগ করেছিলেন তিন-চারজন তাঁর ওপর হামলা চালিয়েছে। পরেরদিনই বিবৃতি বদল করে বলেন, এই ঘটনা ইচ্ছাকৃত নয়, জনসমাগমের কারণে দুর্ঘটনাবশত আঘাত লেগেছে। এখনও পর্যন্ত যে ছবি ভাইরাল হয়েছে, তাতেও দুর্ঘটনার তত্ত্বই প্রমাণিত হয়। এনিয়ে বিশেষ কিছু বলার থাকে না। শুধু এই ঘটনা রাজ্যের বহু বছরের সঞ্চিত যে দুর্ভাগ্যের দিকে আঙুল তুলেছে, সে ব্যাপারে কিছু বলা যাক।

প্রথমেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। তিনি নিঃসন্দেহে অনেক সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে আজকের জায়গাটায় এসে পৌঁছেছেন। সিপিএম-পন্থীরা ব্যঙ্গবিদ্রূপ শুরু করেছে সোশ্যাল মিডিয়ায় যে তিনি নাকি আটের দশক থেকেই এই ধরনের নাটক করতে অভ্যস্ত। কিন্তু বাস্তব সত্যটা আমরা অস্বীকার করতে পারি না, বাম সরকারের নির্মম অত্যাচারের খাঁড়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর নেমে এসেছিল। গোটা রাজ্য তার সাক্ষীও আছে। কিন্তু এটা মুখ্যমন্ত্রীরও বোঝা উচিত, প্রশাসনের সর্বোচ্চ ব্যক্তির চেয়ারে বসা আর বিরোধী নেত্রীর কাজকর্মে কিছু ফারাক থাকা দরকার। অন্তত দেশের সংবিধান এই ফারাকের গণ্ডিটা খুব স্পষ্টভাবে টেনে দিয়েছে।

শুধুমাত্র সেই সংবিধানের বলেই নির্বাচন কমিশন তৃণমূলের অভিযোগের ভিত্তিতে প্রশাসনিক পদে বড়ো রদবদল করতে বাধ্য হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নিরাপত্তায় যদি গাফিলতির অভিযোগ সঠিক বলে প্রমাণিত হয় সে দায় তবে রাজ্যের পুলিশমন্ত্রীর কাঁধেও বর্তায়। রাজ্যের পুলিশমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। তিনি কি এর দায়িত্ব নিয়েছেন? তাঁর পক্ষে একটা যুক্তি হলো, নির্বাচনের সময় পুলিশ-প্রশাসনের ভার নির্বাচন কমিশনের হাতে থাকে; সুতরাং এতে মমতার দায় নেই। কিন্তু নির্বাচন কমিশন স্পষ্টই জানিয়েছে, নির্বাচনের সময় প্রশাসনের দৈনন্দিন কাজে তাঁরা হস্তক্ষেপ করেন না। শুধুমাত্র আইন-শৃঙ্খলার নিয়ন্ত্রণটা তারা হাতে রাখেন, যাতে শাসকদল অন্যায্য কোনও সুবিধা না পেতে পারে।

ঠিক এই জায়গাতেই মমতা ব্যানার্জির প্রধান অসুবিধা। নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হতেই কমিশন পুলিশ-প্রশাসনের শীর্ষস্তরে যেভাবে বদল করেছে এবং এটাও খুব স্পষ্ট ভোটের মুখে আরও কিছু জরুরি অদলবদল ঘটবে, এতে মুখ্যমন্ত্রী খুবই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। তাই একদিকে নির্বাচন কমিশনকে চাপে রাখা এবং অন্যদিকে রাজ্যবাসীর সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা, এই দুয়ের তাগিদেই নন্দীগ্রাম কাণ্ডটি ঘটে গেছে। রাজ্যবাসীর সহানুভূতি মমতা সেদিনই হারিয়েছেন যেদিন ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় এরাজ্যের শাসক দল জনমতকে প্রহসনে পরিণত করেছিল। এর সঙ্গে কিছুটা তুলনীয় বোধহয় এরাজ্যের ১৯৭২-এর বিধানসভা নির্বাচন। যেবার আক্ষরিক অর্থেই রাজ্যবাসীকে রীতিমতো বন্দুকের নলের সামনে রেখে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় পশ্চিমবঙ্গের কুর্সি দখল করেছিলেন। রাজ্যবাসীর কাছ থেকে এর যোগ্য জবাব অবশ্য মমতা পেয়ে গিয়েছিলেন গত লোকসভাতেই। তবু রাজ্যে অনেক জায়গায় বিশেষ করে কলকাতা ও শহরতলী অঞ্চল যেখানে পঞ্চায়েত ভোটের সুযোগ নেই, অবশ্য পুরভোটেও এখানকার নির্বাচকমণ্ডলীর একই অভিজ্ঞতা, সেখানে রাজ্যের শাসক দলের ফল তুলনামূলকভাবে ভালো। কিন্তু সেখানেও বিগত দিনে দলের ভাঙন, ভোটাররা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে এবার বদল তাঁরা আনবেনই। এর ফলে মমতা ভয় পেয়েছেন।

রাজ্যবাসীর সহানুভূতি মমতা সেদিনই হারিয়েছেন যেদিন ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় এরাজ্যের শাসক দল জনমতকে প্রহসনে পরিণত করেছিল। তাই তাঁকে ষড়যন্ত্রের গল্প ফাঁদতে হচ্ছে, হুইল চেয়ারে ঘুরে জনতার সহানুভূতি আদায় করতে হচ্ছে।

তাঁর ভয় পাওয়ার কারণও রয়েছে। তিনি নিজে খুব ভালোভাবে জানেন, লোকে তাঁকে ক্ষমতায় এনেছিল সিপিএমের অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পাবে বলে। গত দশ বছরে রাজ্যের অবস্থাটা মানুষ দেখছেন। অত্যাচার বেড়েছে বই কমেনি। বরং বামফ্রন্টের আমলে সরকারি চাকরির পরীক্ষাগুলো নিয়মিত হতো। সে তাদের ক্যাডারদের কিছু পাইয়ে দেবার জন্য হলেও। তৃণমূলের আমলে সেই জায়গায় এসেছে ক্লাবকে অনুদান, হরেক সরকারি প্রকল্প যার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো নেতাদের কাটমানি খাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া, আর দলের কর্মীদের দু'দশ টাকা দিয়ে বশে রাখা। এই করে পশ্চিমবঙ্গের যুব-প্রজন্মকে বিপথগামী করা হয়েছে দশকের পর দশক ধরে, প্রথমে সিপিএমের আমলে তারপর তৃণমূলের আমলে। বেকারত্ব বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বুকে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। ভোটের আগে বিভিন্ন জনমত সমীক্ষায় এই করুণ চিত্রটা ধরা পড়েছে। মানুষ তাই তাঁকে পছন্দ করছে না এটা মুখ্যমন্ত্রী ভালোই উপলব্ধি করতে পারছেন।

অগত্যা তাই তাঁকে ষড়যন্ত্রের গল্প ফাঁদতে হচ্ছে, হুইল চেয়ারে ঘুরে জনতার সহানুভূতি আদায় করতে হচ্ছে। এগুলো বিরোধী- নেত্রীকে হয়তো মানিয়ে যায় কিন্তু রাজ্যের সর্বোচ্চ প্রশাসককে মানায় না। পশ্চিমবঙ্গের দুর্ভাগ্য, বিগত প্রায় পঞ্চাশ বছর তাদের অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পেতেই নির্বাচনের প্রহর বয়ে যাচ্ছে। নির্বাচনী ইস্যু কখনও মুখ্য হয়ে ওঠেনি যেমন সুশাসন, উন্নয়ন, বেকারত্ব দূরীকরণ ইত্যাদি। এই অন্ধকার দূর না করতে পারলে আগামীদিন খুব বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে। □

দিদির 'পা'-মাটি-মানুষ

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা

নির্বাচনের দামামা যেই বেজেছে অমনি চোট পেলেন দিদি। কলকাতার রাস্তায় স্কুটি চালিয়ে পড়ে যেতে যেতে বেঁচে গিয়েছিলেন। নিরাপত্তা কর্মীরা ধরে ফেলেছিলেন। সেদিন আবার দেখলাম কলকাতার রাস্তায় হুইল চেয়ারে চলেছেন দিদি। নিরাপত্তা কর্মীরা ঠেলে নিয়ে চলেছেন। কিন্তু নন্দীগ্রামে এই নিরাপত্তা কর্মীরা কোথায় ছিলেন?

লড়াই কঠিন। তাহলে এমন নাটক করতে হবে! একবার সেই নাটকের চেহারাটা দেখে নেওয়া যাক। সেই যেদিন 'দুর্ঘটনা' সেদিন সন্ধ্যায় টিভিতে যা যা দেখেছি ও শুনেছি।

নন্দীগ্রামের রানিচকে একটি মন্দিরে হরিনাম সংকীর্তনে অংশ নিয়ে বেরনোর সময় পড়ে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বাঁ পায়ের সঙ্গে মাথা এবং কপালেও চোট লেগেছে। তাঁকে নন্দীগ্রাম থেকে 'গ্রিন করিডর' করে কলকাতায় নিয়ে আসা হচ্ছে সড়কপথে। মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেছেন, ভিড়ের মধ্যে তাঁকে চার-পাঁচজন ধাক্কা দেয়। ষড়যন্ত্রেরও অভিযোগ তুলেছেন তিনি। গোটা ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে বড়োসড়ো প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। মমতা নিজেও অভিযোগ করেন, ঘটনার সময় কোনও পুলিশকর্মী বা জেলার পুলিশ সুপার কেউই ছিলেন না।

টিভিতে বলা হচ্ছিল, হলদিয়ায় মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে ফের

নন্দীগ্রামে ফিরে আসেন মমতা। নন্দীগ্রামে রাত কাটানোর কথা ছিল তাঁর। বিকেলে তিনি যান রানিচকের গিরির বাজার এলাকায়। সেখানে একটি মন্দিরে তিনি হরিনাম সংকীর্তনের অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সেখান থেকে বেরনোর সময়ই পড়ে যান। মমতার দাবি, তাঁকে পিছন থেকে চার পাঁচজন ধাক্কা মারে। তাঁর কথায়, 'ভিড়ের মধ্যে ৪-৫ জন বাইরে থেকে ঢুকে পড়েছিল। ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় আমাকে। ইচ্ছাকৃত ভাবে ধাক্কা মারা হয়। এর পিছনে ষড়যন্ত্র ছিল।' পড়ে গিয়ে পা ফুলে গিয়েছে বলেও জানান মমতা। তিনি বলেন, 'দেখো কিতনা ফুল গয়া।' পড়ে যাওয়ার পর মমতা আর হাঁটতে পারছিলেন না। তাঁকে পাঁজকোলা করে গাড়িতে তোলা হয়। একটি দোকান থেকে বরফ নিয়ে দেওয়া হয় তাঁর বাঁ পায়ে। জড়িয়ে দেওয়া হয় কাপড়। মমতার দাবি, তাঁর বাঁ পা ফুলে গিয়েছে। কপাল ও মাথায় চোট লেগেছে। জ্বর জ্বর ভাবও হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। এমনকী তাঁর বুকে ব্যথা হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন মমতা। টিভিতে দেখছিলাম বলা হচ্ছে, রানিচক থেকে গাড়ি করে মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর অস্থায়ী ঠিকানা রেয়াপাড়ার বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তিনি গাড়ি থেকে নামতে পারছিলেন না। পায়ে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে বলেও জানান। এর পরেই চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় মুখ্যমন্ত্রীকে কলকাতায় নিয়ে আসা হবে। মঙ্গলবার দুপুরে হেলিকপ্টারে নন্দীগ্রাম গিয়েছিলেন মমতা। কিন্তু আহত মমতাকে 'গ্রিন করিডর' করে কলকাতায় নিয়ে আসা হচ্ছে।

সেই মতোই সব হয়। কলকাতায় এনে হাসপাতালে ভর্তিও হন তিনি। পরে মমতা একটি ভিডিয়ো বার্তা দেন হাসপাতাল থেকেই। সেখানে অবশ্য তিনি ঠেলাঠেলির কথা বলেননি। জানান, চাপ লেগেই হয়েছে। ছবিতেও তাই দেখা গিয়েছে। কিন্তু এর পরেও কয়েকটি প্রশ্ন থেকে যায়। কী এমন চিকিৎসা হলো যে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্লাস্টার খোলা গেল, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী বাড়ি ফিরলেন এবং ৭২ ঘণ্টার মধ্যে প্রচারে বেরিয়ে পড়লেন? এসব কথা রাজ্যবাসীর জানা উচিত। কোন অত্যাধুনিক চিকিৎসার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী এত তাড়াতাড়ি আরোগ্য লাভ করলেন সেটাও জানা দরকার। ▯

পাশ্চাত্যের দেশগুলি কেবলমাত্র নিজেদের স্বার্থই দেখে

কৃষ্ণমূর্তি সুব্রহ্মনিয়াম

> ভারতের কোনো রাজ্যে যদি করোনার মৃত্যু পরিসংখ্যানে এমন হেরফের ধরা পড়ত তাহলে পাশ্চাত্য মিডিয়ায় কী ঘটত? সারা ভারত ও তার প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বলা হতো ঠগ ও জোচ্চরদের আড্ডা।

আপাত কিছু মোড়ক বা বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের বাণীর আড়ালে পাশ্চাত্য কখনই নিজেদের অগ্রাধিকার না দিয়ে কিছু ভাবে না। তাই আমাদের দেশ ও তার পরিচালনা নিয়ে তারা কী বলছে তা নিয়ে আমাদেরও বিন্দুমাত্র মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই।

একটা সাধারণ উদাহরণই ধরুন না, ভারতে ক্রিকেট ম্যাচের পিচ বা অত্যন্ত সিরিয়াস করোনা সংক্রমণের মেকাবিলা বা দেশের একান্তই অভ্যন্তরীণ কৃষি বিল সম্পর্কে পাশ্চাত্য থেকে থেকেই যে পর্যবেক্ষণ জারি করেছে তা থেকে আমাদের বেশ কিছু শেখার আছে।

২০০২-০৩-এর মরশুমে নিউজিল্যান্ডে ভারতীয় ক্রিকেট দলের সফরের সময় সেখানে খেলার পিচ এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যা সেখানকার স্যুয়িং বোলারদের ভয়ংকর সহযোগী হয়। পরিণতিতে ২ টেস্ট সিরিজে ভারত ৫৮, ৩৮, ৩৮, ৪৩ ওভারের বেশি ক্রিজে দাঁড়াতে পারেনি। এর মধ্যে দ্বিতীয় টেস্টে আবার একটি মর্মান্তিক রেকর্ড তৈরি হয়। ইনিংসে ভারতের ২২ জন খেলোয়াড়ই (দু'বারে) তখনকার হিসেব অনুযায়ী দু' ইনিংসে কেউই ৫০ রান করতে পারেনি। ভারতের সেই দলে ছিলেন সর্বকালের দিকপাল বিশ্বের সেরা তেন্ডুলকর থেকে দ্রাবিড়, সেহেবাগ, গাঙ্গুলি, লক্ষ্মণের মতো খেলোয়াড়রা। এই একই খেলোয়াড়রা বিশ্বময় সেরা ফার্স্ট বোলারদের বিরুদ্ধে ভারতের হয়ে জয় ছিনিয়ে এনেছেন। এর মধ্যে পেশ বোলারের স্বর্গ হেডিংলি পর্যন্ত ছিল। কিন্তু সেই সময়ের নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক স্টিফেন ফ্লেমিং ঘোষণা করেন যদি ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা বিশ্বসেরাই হবেন তাহলে এখানে খেলতে পারলেন না কেন?

সেদিন ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার কোনো ধারাভাষ্যকার ভারতের পক্ষে দাঁড়িয়ে বলেননি যে এখানকার পিচ সম্পূর্ণ বোলারদের অনুকূল, ব্যাটসম্যানের পক্ষে দুর্বিষহ। সদ্য সমাপ্ত ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজে ইংল্যান্ড দলে যে একমাত্র জো রুট ছাড়া নিতান্তই মামুলি মানের ব্যাটসম্যান নিয়ে সফর করে ভারতের সঙ্গে টিকতে পারছে না তা স্বীকার না করে তারা ভারতের পিচের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করতে ব্যস্ত। ইংল্যান্ডের বেল স্টোক একজন 'মহামান্য অল রাউন্ডার', যদিও ভারতে দু' দুটি সফর সত্ত্বেও তার খেলোয়াড়ি পরিসংখ্যান আদৌ আশাব্যঞ্জক নয়। কিন্তু আপনারা নিশ্চিত থাকুন দ্বিতীয় ইংল্যান্ড সফরে আমাদের বিরাট কোহলির পারফরম্যান্স যদি বেন স্টোকের মতো হতো তাহলে পত্রপাঠ তাঁকে 'গ্রেট ব্যাটসম্যান' থেকে আটপৌরে আখ্যা দিয়ে দেওয়া হতো। আরও লক্ষণীয় ভারতে বিখ্যাত অস্ট্রেলিয়ান বোলার শেন ওয়ার্ন-এর যা সাফল্য সাউথ আফ্রিকার ডেল স্টেন-এর রেকর্ডও সমান। যেমন সমান সেদেশের জ্যাক কালিসের। যেখানে অস্ট্রেলিয় অধিনায়ক রিকি পন্টিং প্রায় ব্যর্থ। তাহলে স্টেন ও ক্যালিসকে ওয়ার্ন ও পন্টিং-এর মতো বড়ো খেলোয়াড় বলা যাবে না কেন? বলা যাবে না এই কারণে যে ভারতের মাটিতে অর্জিত সাফল্য যত বিরাটই হোক না কেন পাশ্চাত্য ভূমিতে সাফল্যের পরিসংখ্যানের উৎকর্ষের সঙ্গে তা কখনই তুলনীয় নয়। এই হচ্ছে দীর্ঘ চর্চিত মানসিকতা।

এবার বহুক্ষেত্রে জাতীয় পরিসংখ্যান নির্মাণ ও তার পূর্বাপর সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নজর দেওয়া যাক। নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল তাঁর সাম্প্রতিকতম এক রিপোর্টে জানিয়েছেন, নিউইয়র্কের একজন 'লিবারেল' ডেমোক্রাট গভর্নর তাঁর দেওয়া তথ্য রিপোর্টে করোনার আক্রমণে বিভিন্ন আমেরিকান নার্সিং হোমগুলিতে মৃতের সংখ্যা ৫০ শতাংশ কমিয়ে দেখিয়েছেন বা জালিয়াতি করেছেন। ওই গভর্নরের প্রধান সহকারী এই তথ্য সমর্থন করেছেন। আচ্ছা, এই জালিয়াতি প্রসঙ্গে আমাদের কোনো বলিউড তারকা যদি ট্যুইট করে কোনো মার্কিনি কি তা নিয়ে আদৌ মাথা ঘামাবে? ভাবুন উলটোটা। ভারতের কোনো রাজ্যে যদি করোনার মৃত্যু পরিসংখ্যানে এমন হেরফের ধরা পড়ত তাহলে পাশ্চাত্য মিডিয়ায় কী ঘটত? সারা ভারত ও তার প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বলা হতো ঠগ ও জোচ্চরদের আড্ডা। সবচেয়ে দুঃখের কথা, বাস্তবে এমন কিছু ঘটলে সেটাকে দীর্ঘ সময় ধরে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া হতো যে কাজে তাদের প্রভূত ও ঢালাও সাহায্য করত ভারতেরই বুদ্ধিজীবী নামধারী এক ধরনের হীনমন্যতায় ভরা শ্রেণী।

এরই বিপরীতে রাখুন ভারতের পরিসংখ্যানের গুণমানের বিরুদ্ধে সংগঠিত

চাপা কিন্তু তীব্র প্রতিবাদগুলি। এটি প্রথম লক্ষ্য করা যায় জিডিপি পরিসংখ্যান তৈরির পদ্ধতিগত পরিবর্তন করার সময়। গেল গেল রব ওঠে— মুড়ি মিছরি সব এক হয়ে গেল। ২০১৯-২০ সালের অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য ইকোনোমিক সার্ভে অনুযায়ী উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে জিডিপি নির্মাণের পদ্ধতির মধ্যে কোনো কারচুপি বা গোপনীয়তাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি । এর থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল ভারতবর্ষে পরিসংখ্যান নির্মাণের পদ্ধতিতে কোনো সাধারণীকরণ বা কোনো ধরনের কারচুপির আশ্রয় নেওয়া হয়নি। এই বিষয়ে ভারতকে খাটো করে দেখানো নিতান্তই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কেননা ভারতের পদ্ধতিকে নিকৃষ্ট প্রমাণ করতে পারলে এটা বলা সহজ হয় যে ভারত গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যানগুলিকে কাটছাঁট করে অর্থনৈতিক উন্নতির হারকে বাস্তব বৃদ্ধির চেয়ে কৃত্রিমভাবে বেশি দেখিয়েছে।

ভারতের অনুসৃত পদ্ধতি অনুযায়ী একেবারেই বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই করোনা-আক্রান্ত বর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে জিডিপি-র ক্ষেত্রে অকল্পনীয় নিম্নগামিতা উঠে এসেছে। আর এমন একটা বডোসড়ো পতনের সময় পরিসংখ্যান নিয়ে কারচুপি করার লোভ সামলানো তো চাট্টিখানি কথা নয়। কিছু আহাম্মক ও ভারত বিদ্বেষী এখনও বলবে যে, জিডিপি-তে ২৩.৯ শতাংশ হারের মহা পতনও তৈরি করা। বাস্তবে তা আরও বেশি। এতে মাথা ঘামানোর কোনো প্রয়োজন নেই। জিডিপি যে সমস্ত ক্ষেত্রের পরিসংখ্যান নিয়ে তৈরি হয় সেগুলি নিয়ে পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায় এই নিন্দুকদের তত্ত্ব কতটাই মিথ্যে। বৈজ্ঞানিকরা চিরকাল তাঁদের সিদ্ধান্তে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনেন যে মুহূর্তে নতুন প্রমাণ তাঁদের হাতে আসে। কিন্তু ভারতের জিডিপি-র ক্ষেত্রে যে পরিসংখ্যানবিদরা নিদান হাঁকেন তাঁরা বাস্তবের নিরেট প্রমাণ হাতে পেয়েও নির্লজ্জ আহাম্মকের মতো তাঁদের পুরনো তত্ত্বেই খাড়া থাকেন। তাঁদের পূর্ব নির্ধারিত অভিসন্ধিই হচ্ছে যদি প্রমাণগুলি তাদের প্রচারিত তথ্যের সঙ্গে খাপ খায় তবেই গ্রহণ কর নচেৎ ছুঁড়ে ফেলে দাও। ঠিক এই সূত্রেই কয়েকমাস ধরে চলা কৃষি বিলের বিরুদ্ধে চলা আন্দোলনের প্রসঙ্গে আসা যাক।

২০১৯ সালের নভেম্বর মাসে যখন ফ্রান্সের অজস্র ট্রাকটর সেদেশের হাইওয়েগুলি আটকে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সে সময় কি বিশ্ববিখ্যাত হলিউডের কোনো তারকা এই অবরোধের সপক্ষে কোনো টুইট করে তাদের সমর্থন জানিয়েছিল? অনেকেরই জানা নেই জার্মানির কৃষকরা সে দেশের আইনসভায় পাশ হওয়া একটি কীটনাশক প্রয়োগ সংক্রান্ত বিতর্কিত বিল নিয়ে তুমুল প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন। জার্মান কৃষকদের বক্তব্য, এই আইন লাগু হলে তাদের জীবনজীবিকা নষ্ট হবে। সে দেশে গেলে বা ইনটারনেট খুললে দেখা যাবে জার্মান শহরগুলির রাস্তা ট্রাক্টরের দীর্ঘ লাইন থাকায় সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে কতগুলি মার্কিন মিডিয়া কী বৈদ্যুতিন কী মুদ্রণ মাধ্যম ফ্রান্স বা জার্মানিতে কৃষকদের এই বিক্ষোভের পাশে দাঁড়িয়ে সে দেশের সরকারগুলিকে স্বৈরতান্ত্রিক ও কৃষকবিরোধী বলে ঘোষণা করেছে? কেউ করেনি। তারা এই কৃষক আন্দোলনকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছে।

এত কিছু দেখার পরও যদি আমরা পাশ্চাত্যের এমন আচরণকে কেবলমাত্র দ্বিচারিতা আখ্যা দিয়ে ছেড়ে দিই সেটি হবে নিতান্তই সরলতা ও বোকামির নামান্তর। ভারতের প্রখ্যাত স্পিন বোলার সম্প্রতি ইউটিউবে একটি চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন। আজকের এই তথাকথিত পোস্ট ট্রুথ বা সত্য পরবর্তী (আসলে মিথ্যে) সময়ে কোনো বিষয়ে একটা মনগড়া তত্ত্ব ও আজগুবি তথ্য মিশিয়ে এক ধরনের ন্যারেটিভ বা মনোহর কাহিনি তৈরি করা হয় যা অনেকাংশেই কোম্পানির তৈরি মাল বেচার বিষয়ে বিশদ পরিকল্পনা নির্মাণের মতো। প্রথমটির ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট ধারণাকে বাজারে তথা মানুষের মনে ঢুকিয়ে দিতে হয়। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে একেবারেই ব্যবহারিক বস্তুটিকে মানুষের অভ্যাসের দাস করে তুলতে হয়।

এ বিষয়ে ১০ বছর আমেরিকায় বসবাসের সূত্রে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে ভারত থেকে আসা কোনো শিল্প সম্মেলনের প্রতিনিধিবৃন্দ বা নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে বক্তব্য বিনিময়ে সফররত— এমনকী নিছক পর্যটকদের মধ্যেও আপাতভাবে যে দৃষ্টিভঙ্গি নজরে পড়বে তা হলো আমেরিকা তথা পাশ্চাত্য দেশগুলি চায় যে ভারত বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য পাক। এটি সর্বৈব লোক দেখানো বা মোটা বাঙ্গলায় মিথ্যে। আমাদের আলোচ্য বিষয়গুলি থেকে দু' রকমের শিক্ষা নিতে হবে। (১) পাশ্চাত্যের বিশ্বদর্শন নিছকই তাদের আত্মকেন্দ্রিক। সেই মতো সেখানকার মিডিয়া তাদের পাঠক তথা দেশবাসী যেটা পছন্দ করে তারা ঠিক সেটাই তাদের খাওয়ায়। (২) ব্যক্তিগত স্বার্থ চিন্তা ন্যারেটিভ তৈরিকে ঠিক তেমনভাবেই প্রভাবিত করে ঠিক যেভাবে কোনো কোম্পানি বাজারে তার মালকে জনপ্রিয় করে তুলতে লড়ে যায়, যাতে তাদের লাভ বাড়ে। সেই জন্য আমাদের সদা সজাগ থাকতে হবে আমাদের পাশ্চাত্য কী ধারণা বিক্রি করতে আসছে। যদি আমরা কোনো রকম ঢিলেমি করি তাহলেই কৌশলে বিশ্ব সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণা আমাদের গলাধঃকরণ করানো হবে। আর এই ভ্রান্ত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত দৃষ্টিভঙ্গি হজম করলে আমাদের নিজেদের সঙ্গে সামগ্রিক ভারতীয় সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

(লেখক ভারত সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা)

শোকসংবাদ

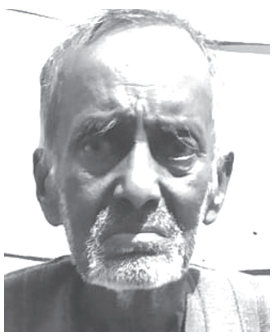

মালদা জেলার গাজোল থানার দেবীদহ নিবাসী হিন্দুত্বনিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব কানাইলাল মণ্ডল গত ৫ মার্চ পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তিনি ৩ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। তিনি স্বস্তিকা পত্রিকার একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন।

রম্যরচনা

বাবার উপদেশ

এক বাবা তার পুত্রকে বলেছিলেন, জীবনে ভালো খাবে, ভালো বিছানায় ঘুমাবে আর ভালো বাড়িতে বসবাস করবে।

পুত্র বললো, বাবা, আমরা তো খুব গরিব। এসব আমার দ্বারা কীভাবে সম্ভব হবে?

বাবা বললেন, যখন প্রচণ্ড খিদে পাবে তখনই খাবে। তাহলে যা খাবে তা অমৃতের মতো মনে হবে। যখন কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়বে, তখন যেখানে ঘুমিয়ে পড়বে সেটাই মনে হবে খুব সুন্দর বিছানা। আর সৎসঙ্গ করতে করতে তোমার মন এত ভালো হয়ে যাবে, সবাই তোমার আপনজন হয়ে তোমাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসবে, সুখে-দুঃখে তোমার বাড়ি আসবে, তখন তোমার কুঁড়ে ঘরই সুন্দর সুন্দর বাড়ি মনে হবে।

* * *

গাড়ির ধাক্কা

দুই দিদি গল্পে মশগুল হয়ে যেতে যেতে এক গাড়িতে ধাক্কা খেলেন। ড্রাইভারকে বললেন, ভাই একটু ধীরে চালাও। ড্রাইভার বলল,— দিদি, আমি তো পার্কিং জোনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখেছি।

উবাচ

"সত্যি কখনও চাপা থাকে না। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ রাজনৈতিক ভাবে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। নন্দীগ্রামের ঘটনা নিয়ে কোনো সহানুভূতি এই ভোটে কাজ করবে না। আমি নিশ্চিত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবার পরাস্ত হবেন। সাধারণ মানুষ জবাব দেবেন। পশ্চিমবঙ্গ বদলের জন্য অপেক্ষা করছে।"

জে পি নাড্ডা
বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি
নন্দীগ্রামে মমতা ব্যানার্জির নাটক প্রসঙ্গে

"অতীতে আমাদের এখানে মুসলমান মহিলারা কখনোই বোরখা পরতেন না। এটা আসলে ধর্মীয় গোঁড়ামির প্রতীক।"

শরথ বীরসেকেরা
শ্রীলঙ্কার জননিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রী
শ্রীলঙ্কায় বোরখা নিষিদ্ধ করা প্রসঙ্গে

"পায়ে চোটের জন্য দিদির কষ্ট হয়েছে। কিন্তু যে বিজেপি কর্মীদের হত্যা করা হয়েছে, তাঁদের মায়েদের কথা কি জানেন দিদি? যাঁরা মারা গিয়েছেন তাঁরা কি কারও ছেলে, দাদা, ভাই নন?"

অমিত শাহ
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
রানিবাঁধের নির্বাচনী সভায় বক্তব্য

"ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ভারতের সামনে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। ধর্মনির্বিশেষে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আনা প্রয়োজন। সেজন্য চাই আইন। কারণ পরিবেশ পৃথিবীকে যে সম্পদ দিয়েছে তা সীমিত হয়ে আসছে, কিন্তু জনসংখ্যা বেড়েছে অনেক গুণ।"

ইন্দ্রেশ কুমার
রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক
ঝাড়খণ্ডের রাঁচীতে এক অনুষ্ঠানে

বাঙ্গালির আজকের বর্ণাঢ্য দোলযাত্রার রূপকার শ্রীচৈতন্য এবং রবীন্দ্রনাথ

প্রবাল চক্রবর্তী

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণে নীল সাগরের কোলে শ্যামল তুলির আঁচড়, সুমাত্রা দ্বীপ। সেই দ্বীপের উত্তরভাগে নিরক্ষীয় বনানী ঘেরা বিশাল এক সরোবর 'লেক টোবা'। শ্যাওলা-নরম তিরতির নীল জল, স্থির ও শান্ত। কে বলবে, নিরীহ এই সরসী আদতে মানব-ইতিহাসের ভয়ংকরতম দুর্ঘটনার হোতা? লেক টোবা বস্তুত এক খুনে মহা-আগ্নেয়গিরি। পঁচাত্তর হাজার বছর আগে প্রলয়ংকর এক অগ্ন্যুৎপাত হয়েছিল এখানে। আগ্নেয়ছাই ছড়িয়ে পড়েছিল ভুবন জুড়ে। সূর্য ঢেকে গিয়েছিল কালো মেঘে, পৃথিবী জুড়ে নেমে এসেছিল যুগব্যাপী এক কালনিশা। যেদিন মেঘ চিরে সূর্য উঠল, দেখা গেল, গ্রহ জুড়ে রয়েছে শুধু মৃত্যুর শীতলতা। মানবজাতি ঝাড়েবংশে শেষ হয়ে গিয়েছে। পড়ে রয়েছে যারা, তারা সভ্যতার পরিভাষাটাই ভুলে গেছে। ভুলে গেছে পূর্বজদের স্মৃতি, উপলব্ধি।

> গৌড়বঙ্গের পুণ্যভূমির দুই-তৃতীয়াংশে দোলযাত্রা আজ আর সর্বজনীন উৎসবের রূপ নেয় না। গণবিস্মৃতির অতলে নিমজ্জিত দুই-তৃতীয়াংশ গৌড়বাসী ভুলেই গেছে তাদের পূর্বজদের বসন্তোৎসবের স্মৃতি। বাকি এক-তৃতীয়াংশ বঙ্গ? সেও তো প্রতিরোধের বঙ্গ হয়ে উঠতে পারেনি, যেটা আচার্য যদুনাথ সরকারের মতো পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠাতারা চেয়েছিলেন।

অন্ধকার সেই রাতে, যখন পৃথিবী জুড়ে চলছিল ধ্বংসের মাতন, ভারতমাতা তাঁর গর্ভে আশ্রয় দিয়েছিলেন মানবসভ্যতাকে। রক্ষা পেয়েছিল মানুষের সঞ্চিত জ্ঞান, প্রযুক্তি, সংস্কৃতি, ললিতকলা। অন্ধ্রপ্রদেশের কর্নুল জেলার জুরেরু নদীর উপত্যকার জ্বালাপুরমে পাওয়া গেছে কমপক্ষে এক লক্ষ বছরের পুরোনো মানবসভ্যতার নিদর্শন। টোবা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে সারা পৃথিবীর মতো ওই অঞ্চলও ঢেকে গিয়েছিল পুরু ছাইয়ের আস্তরণে। তবু মানবসভ্যতা সেখানে ধ্বংস হয়নি। সভ্যতার স্রোত যা অগ্ন্যুৎপাতের আগে বহমান ছিল, পরেও তা একইভাবে এগিয়ে চলেছিল উৎকর্ষের অভিমুখে। এই ভারতবর্ষে।

জ্বালাপুরমকে মাপকাঠি ধরলে ভারতীয় সভ্যতা কমপক্ষে লক্ষ বছরের পুরোনো। গত লক্ষ বছরে সব প্রাচীন সভ্যতাই বিলুপ্ত হয়েছে। আমরা এগিয়ে চলেছি। ভারতীয় সভ্যতার অমরত্বের রহস্য কোথায় লুকিয়ে আছে? মধুকবি বলেছেন, 'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে।' কথাটা তো সম্পূর্ণরূপে সত্যি নয়। অমরত্বের রহস্য লুকিয়ে আছে জন্মান্তরে। সভ্যতা অমরত্ব পায়, যখন তার জীবনশৈলী, মূল্যবোধ, তার উৎসবগুলো যুগে যুগে নবকলেবর পায়। রোমান সভ্যতা আজ মৃত। কারণ, আজ আর স্যাটার্নালিয়া উৎসব পালিত হয় না রোমের বুকে। স্যাটার্নালিয়া উৎসবকে ঘিরে কোনো ভালোবাসা, কোনো উন্মাদনা আর নেই সে দেশের মানুষের মনে। উৎসব মরলে সভ্যতাও মরে। উৎসব বেঁচে থাকে পুনর্জন্মের মাধ্যমে, নবকলেবরের মধ্যে দিয়ে। যুগে যুগে পুরোনো উৎসবকে পালন করার নতুন নতুন কারণ, নতুন নতুন অনুপ্রেরণা খুঁজে পেতে হবে সভ্যতাকে। সেটাই সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে চলে যুগ থেকে যুগান্তরে। যেমন ধরুন, আমাদের এই দোলযাত্রা বা হোলি। প্রথম কবে এদেশের মানুষ বসন্তকালকে স্বাগত জানাতে পরস্পরকে ফুলের রেণুর রং মাখিয়ে অন্তরের প্রীতি জানিয়েছিলেন? কেউ জানে না। প্রকৃতিনির্ভর বসন্তোৎসবের পরম্পরা

> কলকাতার বুকে এক দাঙ্গা দেখেছিলাম নব্বইয়ের দশকে, যার উৎস ছিল সামান্যই। একটা বাচ্চা অন্য একটা বাচ্চাকে দোলের দিনে রং দিয়েছিল। ঘটনাচক্রে অন্য বাচ্চাটি ছিল সেই আত্মবিস্মৃত জনগোষ্ঠীর। সেদিন অনেক ভেবেও বুঝতে পারিনি, ওদের এই ঘৃণা কী দোলের রংকে, নাকি অবদমিত আত্মপরিচয়কে?

জ্বালাপুরমের মতোই প্রাচীন, এই জম্বুদ্বীপে।

জ্বালাপুরমের কালখণ্ড থেকে চলুন, সময়ের চাকা ঘুরিয়ে আরেকটু এগিয়ে দেখি। এ এমন এক পৃথিবী, যে এখনো রামায়ণ বা মহাভারত পড়েনি। পুরুষোত্তম রাম বা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম দেখতে আরও বহু হাজার বছর প্রতীক্ষা করতে হবে মনুসন্তানদের। এ এমনই এক কালখণ্ড। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুর ঘোর বিরোধী। যে সম্রাট বিশ্বজুড়ে 'অসু বিনে উপাস্য নেই' প্রচার করছেন, তাঁর ছেলে প্রহ্লাদ কিনা বিষ্ণুভক্ত। রেগেমেগে হিরণ্যকশিপু অবাধ্য প্রহ্লাদকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন। কিন্তু যতবারই প্রহ্লাদকে মারবার চেষ্টা হয়, প্রহ্লাদ বেঁচে যায়। হিরণ্যকশিপুর বোন হোলিকার এক বিশেষ শক্তি ছিল, আগুনে তার কিছুই হতো না, প্রতিদিন সে জলের বদলে আগুনে স্নান করত। হিরণ্যকশিপুর নির্দেশে হোলিকা প্রহ্লাদকে কোলে নিয়ে আগুনে ঝাঁপ দিল। অবাক কাণ্ড! বিষ্ণুর অপার লীলায় আগুনে পুড়ে ছাই হলো হোলিকা, প্রহ্লাদের কিছুই হলো না। সেই লীলা স্মরণ করে ভক্তরা আজও হোলিকার পুতুল দহন করে, আনন্দে আবির মাখে।

কাট-টু আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগের কালখণ্ডে। ব্রজভূমি আলো হয়ে আছে ননীচোরা বালকৃষ্ণের অনির্বচনীয় রূপে। একদিন শ্রীকৃষ্ণ মা-কে গিয়ে বললেন, মা! রাধা কত ফর্সা, আমি কেন এত কালো হলাম গো? মা যশোদা কৃষ্ণকে আদর করে বললেন, তাতে কী হয়েছে বাছা? আগামীকাল বসন্তোৎসব, তুই বরং রাধাকে গিয়ে রং মাখাস! দোলপূর্ণিমার সেই স্বর্গীয় রাতে আবিরের রঙে শরীর-মন রাঙিয়ে রাধাকৃষ্ণ যুগলে বনের শাখায় দড়ি বেঁধে দোলায় দুলেছিলেন, বসন্তের পূর্ণচন্দ্রকে সাক্ষী রেখে। সেই থেকে হোলিকা দহন বা হোলির আরেক নাম হলো দোলযাত্রা। বালক শ্রীকৃষ্ণের সামনে সেদিন ছিল সমস্যার পাহাড়। কংসের ক্রমাগত আক্রমণে বিধ্বস্ত হচ্ছিল ব্রজভূমি, বিপর্যস্ত হচ্ছিল সাধারণ মানুষের স্বাধীনভাবে বাঁচার ন্যূনতম সাধ। সেই সংকটময় কালখণ্ডে দোলযাত্রার উৎসব ব্রজভূমির মানুষদের বিদ্রোহের অঙ্কুরটিকে পালন করে চলার ভরসা জুগিয়েছিল। পৌরাণিক হোলিকা দহনের সে আরেক নবকলেবর।

কালচক্র ঘুরিয়ে আরেকটু এগিয়ে আসি। সেই একই দিনে, আজ থেকে পাঁচ শতাব্দী আগে, গৌড় বঙ্গের পুণ্যভূমিতে দোলপূর্ণিমার চাঁদের আলোয় জন্ম হলো চৈতন্যদেবের, যাঁর ইন্দ্রজালে আগামী যুগে আমেরিকা থেকে রাশিয়া সর্বত্র পথেঘাটে শোনা যাবে হরিনাম। চৈতন্যদেবের অভূতপূর্ব সাংগঠনিক শক্তির পরিচয় পেল বাঙ্গালি। কাজিদমন করে নবদ্বীপের পথেঘাটে ঢল নামল ভক্তের। যবন হরিদাস ফিরে এল ঘরে। নবদ্বীপ থেকে পুরীধাম সর্বত্র বান ডাকলো ভক্তির। রক্ষা পেল বাঙ্গালির সংস্কৃতি, পেল নবকলেবর। নিমাইয়ের প্রেমে মাতোয়ারা বাঙ্গালি সেই থেকেই তাঁর অনুসরণে হোলি নয়, 'দোলযাত্রা' বলে বসন্ত উৎসবকে।

আরেকটু এগিয়ে এসে পড়লাম আধুনিক যুগে। বসন্ত উৎসব আবার নবকলেবর পেল, এবার রবিঠাকুরের হাতে। অন্ধ পাশ্চাত্য অনুকরণের সেই দুর্দিনে বাঙ্গালি আবার ফিরে পেল তার সংস্কৃতি। লালমাটির পথ ছেয়ে গেল পলাশ ফুলে, অনুরণিত হলো বৈতালিক গানে— 'খোল দ্বার খোল, লাগল যে দোল'! স্থল জল বনতল পূত হলো সেই নব-অভিষেকে। প্রাচীন প্রাকৃতিক বসন্তোৎসবকে রবিঠাকুর ফিরিয়ে দিলেন তার উৎসমুখে। রাধাকৃষ্ণের প্রেম, আবিরের মেঘ ও বৈতালিক নৃত্যগীতে সাজানো বাঙ্গালির বর্ণাঢ্য দোলযাত্রার যে রূপ আজ আমরা দেখি, সেটা চৈতন্য ও রবিঠাকুর— এই দুই মহামানবেরই সম্মিলিত দান।

দোলযাত্রার নবকলেবরের পরম্পরা আগামী যুগেও বজায় থাকবে তো? সন্দেহ জাগে। গৌড় বঙ্গের এই পুণ্যভূমির দুই-তৃতীয়াংশে দোলযাত্রা আজ আর সর্বজনীন উৎসবের রূপ নেয় না। গণবিস্মৃতির অতলে নিমজ্জিত দুই-তৃতীয়াংশ গৌড়বাসী ভুলেই গেছে তাদের পূর্বজদের বসন্তোৎসবের স্মৃতি। বাকি এক-তৃতীয়াংশ বঙ্গ? সেও তো প্রতিরোধের বঙ্গ হয়ে উঠতে পারেনি, যেটা আচার্য যদুনাথ সরকারের মতো পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠাতারা চেয়েছিলেন। যারা রয়েছে এই খণ্ডিত বঙ্গে, তারা হামেশাই চোখ-রাঙানির শিকার। অ্যাই ব্যাটা কাফের, এইসব পৌত্তলিক উৎসব বন্ধ কর! উৎসব তো একটাই, যেটাতে শ্রীকৃষ্ণের স্নেহধন্য নিরীহ গোরু জবাই করে পথে রক্তের স্রোত বইয়ে দেওয়া যায়! সেটা না হলে কি আর উৎসব? কলকাতার বুকে এক দাঙ্গা দেখেছিলাম নব্বইয়ের দশকে, যার উৎস ছিল সামান্যই। একটা বাচ্চা অন্য একটা বাচ্চাকে দোলের দিনে রং দিয়েছিল। ঘটনাচক্রে অন্য বাচ্চাটি ছিল সেই আত্মবিস্মৃত জনগোষ্ঠীর। সেদিন অনেক ভেবেও বুঝতে পারিনি, ওদের এই ঘৃণা কী দোলের রংকে, নাকি অবদমিত আত্মপরিচয়কে?

আশা হয়, অন্ধকারে আলোর তপস্যার দিনগুলো বুঝি-বা শেষ হলো। সূর্য উঠছে খণ্ডিত বঙ্গভূমিতে, কালচে লাল থেকে কমলা হচ্ছে ধীরে ধীরে। বাতাসে প্রকৃতির সোঁদা গন্ধ, সঙ্গে মিশে আছে টাটকা আবিরের গন্ধ। অনেক মায়া সেই বাতাসে। এই মায়ার ভালোবাসাতেই তো আমার পূর্বজরা সর্বস্ব খুইয়ে ওপার বাঙ্গলা থেকে পালিয়ে এসেছিলেন, তবু ধর্ম খোয়াননি। ধর্মান্তর আমাদের জীবন থেকে উৎসবগুলোকে আমার রক্তের অধিকারকে, আমার সভ্যতাকে ছিনিয়ে নেয়। আজ সকালের ঠাণ্ডা বাতাসে বিদেহী হাতের পরশ। বিস্মৃত জন্মের অন্তরাল সরিয়ে ভিড় করছে অজস্র অশরীরী। গাছের ফাঁকে কুয়াশার লুকোচুরিতে তাদের ফিসফিস। ওরা কি আমাদের পূর্বজ? যারা বুকের আড়াল দিয়ে বাঁচিয়েছিল সমাজটাকে? টোবা অগ্ন্যুৎপাত থেকে হিরণ্যকশিপু, মহম্মদ ঘোরি থেকে গভর্নর অ্যান্ডারসন, ইতিহাসের প্রতিটি সর্বনাশী আক্রমণ থেকে? যারা ভয়কে জয় করে জীবনের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল যুগ থেকে যুগান্তরে? আজ দোলের সকালে ওঁরা কি আমাদের কিছু প্রশ্ন করতে চাইছেন?

(লেখক অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী অধ্যাপক)

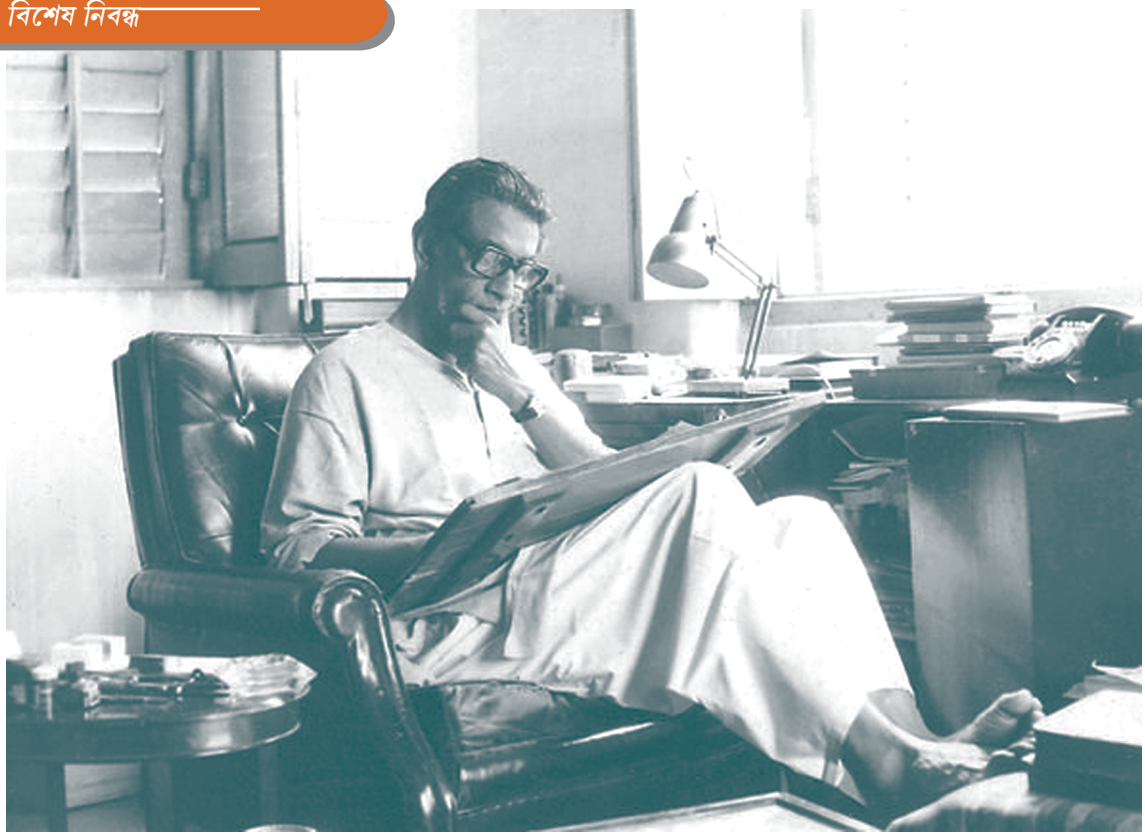

সাহিত্যিক সত্যজিৎ

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে সত্যজিৎ রায়কে ব্যারিস্টার করুণাশঙ্কর রায় জিগ্যেস করেছিলেন, আপনি সমসাময়িক কালকে যেভাবে জানেন, আমাদের অনেকেরই মনে হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি জানেন অতীতকে, এক বিগত পিরিয়ডকে, যা মাঝে মাঝে আপনার ছবিতে আশ্চর্য জীবন্ত ভাবে চিত্রিত হয়ে যায়। আমাদের এই ধারণা কি সঠিক?

প্রশ্নটা খুব পছন্দ হয়েছিল সত্যজিতের। ব্রিটেন থেকে বিশাল সাইজের এক টেপ রেকর্ডার নিয়ে এসেছিলেন সদ্য বিলেত ফেরত করুণাশঙ্কর। সেই সময়ে এমন উন্নত মানের রেকর্ডিং যন্ত্র কলকাতায় প্রায় কেউ চোখেই দেখেনি। এই সাক্ষাৎকার অভিযানে করুণাশঙ্করের সহযাত্রী হিসেবে টিমে ঢুকে পড়েছিলেন আরও চার দাপুটে তরুণ। বুদ্ধদেব বসুর পুত্র শুদ্ধশীল বসু, অধ্যাপক অমিয় দেব, অধ্যাপক সুবীর রায়চৌধুরী ও জ্যোতির্ময় দত্ত। জ্যোতির্ময়ের কলকাতা পত্রিকার তখন সোনার দিন। সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, পুরাতত্ত্বের ওপর একের পর এক ঝলমলে লেখা প্রকাশিত হয়ে চলেছে। তেমনই এক সময়ে, ষাটের দশকের শেষদিকে, সত্যজিতের লেক টেম্পল রোডের বাড়িতে চড়াও হতেন এই সাক্ষাৎকার-ব্রিগেড। দীর্ঘকায় সত্যজিতের হাতে সিগারেটের টিন, পাশে সেই বিখ্যাত স্কেচ-প্যাড, পায়ের ওপর পা তুলে রিল্যাক্সড ভঙ্গিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলে যেতেন তিনি। অন্য ঘর থেকে বিজয়া রায় অক্লান্ত জুগিয়ে যেতেন চা এবং এটা-সেটা। পেল্লায় সেই টেপ রেকর্ডার মাঝে মাঝে আটকে যেত। তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন করুণাশঙ্কর। আর সেই ফাঁকে চটজলদি দু-একটা প্রশ্ন করে নিতেন দলের অর্বাচীন সদস্যরা। সে ছিল আগলে রাখার মতো অনুপম স্মৃতি।

তো, করুণাশঙ্করের মুখে মনের মতো প্রশ্ন শুনে একটু নড়েচড়ে বসলেন সত্যজিৎ। তুলে আনলেন 'দেবী' আর 'চারুলতা'র প্রসঙ্গ। বললেন, চারুলতার একটা ভীষণ চ্যালেঞ্জ তো ছিলই। পরে সে সম্বন্ধে পড়েছি, অনেকদিন ধরে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে খবরের কাগজের ফাইল ঘেঁটেছি— তখনকার বিজ্ঞাপন, তখনকার এডিটোরিয়াল, তখনকার টাইপোগ্রাফি, তখনকার কাগজের ফরম্যাট। পড়তে পড়তে সমস্ত জিনিসটা কীরকমভাবে জ্যান্ত হয়ে উঠতে থাকে। তখন তাতে যা উৎসাহ পাওয়া যায়, সেটা আজকের জীবন, যেটা সকলেই দেখছে এবং আমার কোনও এক্সক্লুসিভ প্রপার্টি নয়, সেখানে সেই চ্যালেঞ্জটা এতবড়ো বলে মনে হয় না। কেননা এই রিয়্যালিটির সঙ্গে তো সকলে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতে পারে। এখানে কিন্তু আমি জিনিসটা রিক্রিয়েট করছি, অথচ আই অ্যাম ক্রিয়েটিং দ্যাট কনভিকশন বাই ভার্চু অব সার্টেন ডিটেলস। তবে হ্যাঁ। ডিটেলের প্রশ্ন সব সময়েই আছে। আজকের দিনটাও যখন সিনেমার পর্দায় তুলে ধরার চেষ্টা করব, তখন পারিপার্শিক চেহারার মিল ছাড়াও মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ছোটোখাটো ডিটেলের মধ্যে দিয়েই সেটা ফুটিয়ে তুলতে হবে।

কোনও সন্দেহ নেই সিনেমাটা ছিল সত্যজিৎ রায়ের মজ্জায় মজ্জায়। গোটা পৃথিবী অচিরেই তাঁকে সেই পরিচয়ে চিনেছে। কিন্তু রূপ-স্পর্শ-গন্ধময় অনবদ্য চলচ্চিত্রের স্রষ্টা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পরেও গুটিয়ে

যাননি সত্যজিৎ। অবলীলায় নেমে পড়েছেন সাহিত্যসৃষ্টির মতো আরও এক বর্ণময় জগতে। বইয়ের কভার, ইলাস্ট্রেশন, গ্রাফিক ডিজাইন এসব তো ছিলই। তারই মধ্যে সময় করে লিখে যেতেন সংগীত, শিল্প, চলচ্চিত্র নিয়ে প্রবন্ধ। লিখতেন গল্প, কবিতা, ছোটোদের-বড়োদের মনের মতো একের পর এক লেখা। জিজ্ঞেস করলে বলতেন, ও সব লিখতাম 'সন্দেশ'-এর জন্য। সন্দেশ না এলে হয়তো আমার লেখা আরম্ভই হতো না।

আসলে সত্যজিতের লেখার পিছনে বংশের একটা ব্যাপার ছিলই। রক্তের ভেতরে যদি কিছু থেকে যায়, পালাবেন কোথায়? উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার রায়, লীলা মজুমদার, সুখলতা রাও— উত্তরাধিকার অস্বীকার করা বড়ো শক্ত। সত্যজিৎ নিজে অবশ্য পারিবারিক উত্তরাধিকার নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামাতেন বলে মনে হয় না। বলতেন, 'উত্তরাধিকার? আই ডোন্ট নো। আমার ছেলেবেলা থেকে ছড়া বা কবিতা লেখায় ঝোঁক ছিল তা নয়। আমি প্রথম ছড়া লিখলাম 'সন্দেশ'-এ এবং সেটা হচ্ছে লিয়রের অনুবাদ।' এরপর লুইস- লিয়রের প্রায় তিরিশ-চল্লিশটি লিমেরিক, লিয়রের বড়ো কবিতা, ক্যারলের জ্যাবারওয়াকি— একে একে সবই অনুবাদ করেছেন। এবং সিনেমার পাশাপাশি হাতে একটু অবসর পেলেই ডুবে গেছেন সাহিত্য রচনায়।

হাতে যখন সিনেমার কাজ থাকত না, বাড়িতে বসে অখণ্ড বিশ্রাম নিতে কেউ কখনও তাঁকে দেখেনি। সবসময়েই কিছু না কিছু করছেন। কখনও লিখছেন চিত্রনাট্য, কখনও করছেন ইলাস্ট্রেশন, কখনও ডুবে আছেন গল্প লেখায়। এইভাবেই একের পর এক লিখে ফেলেছেন প্রফেসর শঙ্কুর ৩৮টি গল্প— সেই ১৯৬১ থেকে শুরু করে ১৯৯০ অবধি। লিখেছেন ফেলুদা সিরিজের ৩৪টি কাহিনি— ১৯৬৫ থেকে ১৯৯২ অবধি যাদের বিস্তার। লিখেছেন ডজন ডজন অন্যান্য গল্প। শুধু গল্প নয়, ছোটো উপন্যাসের আকারে লিখেছেন ফটিকচাঁদ, বিভূতিভূষণের কাহিনি আশ্রয় করে চিত্রনাট্য 'বাক্সবদল'।

একটা কথা আমরা সকলেই জানি, সত্যজিতের ফিল্ম কিন্তু সাহিত্যকে আশ্রয় করেই ডালপালা ছড়িয়েছিল। তাঁর প্রথম ছবির কাহিনি বিভূতিভূষণের। আসলে অপু ট্রিলজির তিনটি ছবিরই আশ্রয় বিভূতিভূষণ। এরপর একে একে এলেন রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার, তারাশঙ্কর, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শরদিন্দু, পরশুরাম— এমন সব দিগ্‌বিজয়ী কথা সাহিত্যিক। ছবি বানাতে গেলে একটা যে আদি-মধ্য-অন্ত্য সংবলিত নিটোল গল্প লাগে এটা তিনি প্রথম থেকেই উপলব্ধি করেছিলেন। তরুণ মজুমদার সত্যজিৎকে নিয়ে স্মৃতিচারণে লিখেছেন : 'উনি প্রায়ই বলতেন, খেয়াল করেছো তরুণ, ছবিওয়ালারা আজকাল গপ্পোটা একেবারে জমাতে পারছে না। ভালো গপ্পো না হলে ভালো ছবি হবে কী করে এটা কেউ ভেবে দেখছে না।' সত্যি তো, ভালো গল্প ছাড়া কী করে তৈরি হবে ভালো সিনেমা? ফলে সিনেমা করতে করতেই তিনি নেমে পড়লেন গল্প লিখতে। সামনে ছিল পারিবারিক সন্দেশ পত্রিকা, বহুদিন ধরে যে কাগজটি তিনি সম্পাদনা করেছিলেন। নিজেই বলছেন সত্যজিৎ : 'ওই রবীন্দ্রনাথের সেন্টিনারি হলো। তারপরেই ৬১-তে বোধহয় সন্দেশ রিভাইভড হলো। ৬১-তেই আমার অনেকগুলো কবিতা বেরিয়েছে। তারপরে বেরোল প্রফেসর শঙ্কুর বড়ো গল্পটা। তারপর শঙ্কু একটা চরিত্র হয়ে গেল— শঙ্কু নিয়ে একগাদা— তারপর ওই ফেলুদা হলো। ফেলুদার দুটো শর্ট স্টোরি বেরোল— তারপর উপন্যাস লিখলাম। প্রথম উপন্যাস বাদশাহী আংটি।' এমন ভঙ্গিতে সাক্ষাৎকারে কথাগুলো বলছেন সত্যজিৎ, যেন সন্দেশের পাতা ভরাতে লিখতে বলছিল অনেকে, তাই তিনি লিখে ফেলেছেন, ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়! কিন্তু সত্যজিতের গল্পগুলোর দিকে যদি আমরা তাকাই, বুঝতে সময় লাগে না গত ৫৫-৬০ বছর ধরে যে-লেখা আমরা ভালোবেসে পড়ছি, প্রিয়জনকে উপহার দিচ্ছি, আমাদের ব্যক্তিগত সংগ্রহে বহু যত্নে রাখা আছে তাঁর কল্পবিজ্ঞান, রহস্যগল্প আর গোয়েন্দা কাহিনির বইগুলো— দুর্লভ কোনও গুণ না থাকলে কার্যত অসাধ্য ছিল এতকাল একইরকম জনপ্রিয় থাকা। জীবন যন্ত্রণা, অস্তিত্বের সংকট, গভীর কোনও দার্শনিক জিজ্ঞাসায় কখনই ভারি হয়ে ওঠেনি তাঁর গল্প— যে কাহিনিগুলোর 'টার্গেট অডিয়েন্স' প্রধানত ছোটোরা। অথচ তাদের মনের মতো করে লেখা রহস্যগল্প, কল্পবিজ্ঞান বা গোয়েন্দা কাহিনির ভাঁজে ভাঁজে বিদ্যুৎ চমকের মতো এমন কিছু উপাদান লুকিয়ে থাকে যে, বই হাতে নিয়ে মুগ্ধ হয়ে যান বড়োরাও। সত্যজিৎ নিজেই বলেছেন, 'বয়স্ক উপাদান না থাকলে ছোটো বড়ো সকলেই ফেলুদার গল্প পড়ত না। তবে এমন কোনও ফেলুদার উপন্যাস লেখার ইচ্ছে আমার নেই যাতে শুধুই বয়স্কদের জন্য উপাদান থাকবে।'

প্রফেসর শঙ্কুর প্রথম গল্পটাই ধরা যাক। ব্যোমযাত্রীর ডায়রি। সুন্দরবনের গভীরে কোথায় যেন মহাকাশ থেকে উল্কা এসে আছড়ে পড়েছে। মহাজাগতিক এই বিপর্যয়ে বেশ কিছু জন্তুজানোয়ার এমনকী দু-একটা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারও মারা পড়েছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু দিন কয়েক কেটে যাওয়ার পর তাদের মৃতদেহগুলো কোথায় গেছে তার আর খোঁজ নেই। প্রফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কুর ডায়রিটা যাঁর কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল, সেই তারক চাটুজ্যেই গল্পটা বলেছেন কাহিনির কথককে। উল্কা আছড়ে পড়ে যেখানটায় গর্ত হয়েছিল, তারই ঠিক মধ্যিখানে এই ডায়রিটা তিনি নাকি খুঁজে পেয়েছেন। লাল লাল কী একটা মাটির ভেতর থেকে উঁকি মারছে দেখে টেনে তুললেন। তাতে শঙ্কুর নাম দেখেই সোজা পকেটে। কিন্তু এ কেমন ডায়রি? প্রথমবার কালির রং ছিল সবুজ। পরে হয়ে গেল লাল। তারপর আবার নীল। দেখতে দেখতে চোখের সামনে নীলটা হয়ে গেল হলদে। দেখলে বুকটা ধড়াস করে ওঠে। বাড়ির ভুলো কুকুরটা যা পায় তাতেই দাঁত বসায়। কী আশ্চর্য! ওই খাতার কাগজের তার কামড়ে কিচ্ছু হলো না। এ কী কাগজ রে বাবা!

যিনি গল্পের লেখক, তাঁর নাম দেননি সত্যজিৎ। ধরে নেওয়া যাক সত্যজিৎ নিজেই এর কাহিনিকার। তাঁর বয়ানে ওই ডায়রি থেকে যে গল্পটা এরপর উদ্ধার হলো তা একদিকে যেমন রহস্যঘন অ্যাডভেঞ্চার, অন্যদিকে অতি উচ্চস্তরের সায়েন্স ফিকশনও বটে। জবরদস্ত একখানা রকেট বানিয়েছেন প্রফেসর শঙ্কু। বুঝে নিয়েছিলেন, মঙ্গলগ্রহে অভিযান করতে গেলে সাধারণ ধাতু দিয়ে এ রকেট তৈরি হতে পারে না। চাই অন্যরকম এক কম্পাউন্ড। ব্যাঙের ছাতা, সাপের খোলস, কচ্ছপের ডিমের খোলা মিশিয়ে একটা চেহারা নিল। এরপর তাতে দিতে হবে ট্যানট্রাম বোরোপ্যাক্সিনেট অথবা একুইয়স ভেলোসিলিকা।

বিস্তারিত বিবরণে যাচ্ছি না। কারণ প্রফেসর শঙ্কুর বিজ্ঞানভিত্তিক অ্যাডভেঞ্চারের গল্পগুলো পড়েননি, বাঙ্গালি সমাজে এমন পাঠক দুর্লভ। মঙ্গলগ্রহ অভিযানের এই গল্পে রকেটটা যখন প্রহ্লাদ, বিধুশেখর, প্রিয় সারমেয় নিউটন আর প্রফেসরকে নিয়ে মঙ্গল ছেড়ে অন্য এক সৌরজগতের দিকে উড়ে চলেছে— তখন গুলিয়ে যাওয়া দিন-ক্ষণ- মাস-বছর পিছনে

ফেলে হাজির হলো অদ্ভুত অবিশ্বাস্য এক জগৎ। রকেটের জানলা দিয়ে যতদূর চোখ যায় 'আকাশময় কেবল বুদ্বুদ ফুটছে আর ফাটছে। এই নেই এই আছে, এই আছে এই নেই! অগুনতি সোনার বল আপনা থেকে বড়ো হতে হতে হঠাৎ ফেটে সোনার ফোয়ারা ছড়িয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। এ যেন সৌরজগতের কোনও বাদশাহের উৎসবে আতশবাজি খেলা।'

ষাটের দশকের শেষদিকে তখন আমরা স্কুলে পড়ি। সে সময়ে কলকাতার বেশ কয়েকটা সিনেমা হলে নিয়মিত হলিউডের ছবি আসত। বাড়ির বড়োদের প্রশ্রয়ে এমন দু-একটা সিনেমা দেখার সুযোগ পেয়ে চোখের সামনে অন্য এক পৃথিবীর দরজা খুলে গিয়েছিল যেন। এমন সময়ে এলিট কিংবা লাইটহাউসে মুক্তি পেল এক হলিউডি সায়েন্স ফিকশন— টু জিরো জিরো ওয়ান আ স্পেস ওডিসি— পরিচালক স্ট্যানলি কুব্রিক। আমার ধারণা, আমাদের বয়সি অনেকেই সে সময়ে দেখেছিলেন ছবিটা। ডেভিড বাওম্যান, উইলিয়ম সিলভেস্টার, স্ট্যানলি কুব্রিকের অবিস্মরণীয় অভিনয়ে উজ্জ্বল এই ছবি সারাজীবনেও ভুলে যাওয়া শক্ত। স্পেসশিপ নিয়ে বৃহস্পতির কক্ষপথে যখন প্রবেশ করল ক্যাপ্টেন বাওম্যান আর তার সঙ্গীরা, নীচে উপরে কখনও-বা জানলার পাশে সৌরজগতের অতিকায় গ্রহজুড়ে সে কী অলৌকিক আগ্নেয় দৃশ্য! হাজার হাজার আগ্নেয়গিরি উদ্গীরণ করছে বহুবর্ণের আগুন। গ্রহজুড়ে ছড়িয়ে থাকা গ্যাসীয় বায়ুমণ্ডলে অনবরত ফুলে উঠেছে ফেটে যাচ্ছে আগুনের বুদ্বুদ। ইহজীবনে এমন দৃশ্য যে কখনও দেখতে পাবেন, এমনটা বোধহয় কল্পনাও করেননি মহাকাশযানের যাত্রীরা। কিন্তু তাঁরা দেখলেন। আর দেখলেন বিশ্ববিখ্যাত সেই ফিল্মের দর্শকরা। সত্যজিতের গল্পেও আমরা পেয়ে যাই বর্ণময় ফ্যান্টাসি আর বিজ্ঞাননির্ভর অ্যাডভেঞ্চারের একই ধরনের সমাহার। পড়তে পড়তে হঠাৎ উপলব্ধি হয়, এই জাতীয় ফ্যান্টাসি আর তার নিপুণ নিখুঁত দৃশ্যমানতা যিনি অনায়াসে ফুটিয়ে তুলতে পারেন, তিনি আদতে একজন বিশ্বমানের চলচ্চিত্র নির্মাতা। তাই ছোটোদের জন্য লিখতে বসেও সেই গল্পের আনাচে-কানাচে তিনি ছাপ রেখে যান একজন ফিল্ম মেকারের। নিখুঁত মাপজোক, অভাবনীয় অ্যাঙ্গেল— গল্পের বর্ণনাও অনেক ক্ষেত্রে যেন ক্যামেরার ফ্রেম-বাই ফ্রেম-এর শর্ত মেনে করা।

এবার একটা গল্প ফেলুদা সিরিজ থেকে। গল্পটা সবাই জানেন, বাড়ির সবাই দল বেঁধে হলে গিয়ে দেখেছেনও— সোনার কেল্লা। দেশ দেখতে বেরিয়ে পড়েছে ফেলুদা, তোপশে আর তাদের নতুন সঙ্গী জটায়ু। অবশ্য দেশ দেখা বলতে যা বোঝায়, মনের মধ্যে একটা ফুরফুরে ভাব, তেমন মন নিয়ে বেরোতে পারেনি তারা। কারণ হাতে রয়েছে এক মামলা— তার সুবাদেই রাজস্থানে আসা— গন্তব্য পাকিস্তানের সীমান্ত ঘেঁষা জয়সলমির। পরে অন্য এক জায়গায় মন্তব্যও করেছেন সত্যজিৎ : 'আমার সোনার কেল্লার প্রতি একটা দুর্বলতা আছে, কারণ সেখানেই প্রথম জটায়ুর আবির্ভাব।' নিছক আবির্ভাব নয়, গল্পকার সত্যজিৎ যেন চাইছিলেন ফেলুদা আর তোপশের চোখ দিয়ে যে রহস্যগুলো এতদিন দেখত গোয়েন্দা গল্পের আগ্রাসী পাঠক, এবার তাদের দেখার চোখে যুক্ত হোক আরেক নতুন দৃষ্টিকোণ, নতুন একটা লেন্স— যার নাম জটায়ু ওরফে লালমোহন গাঙ্গুলি। অর্থাৎ গল্প বলায় নতুন একটি মাত্রা যোগ হলো। জটায়ু জনপ্রিয় রহস্য কাহিনি লেখক। যাঁর লেখার মূল আকর্ষণ বল্গাহীন কল্পনা, বেশ কিছু এলোমেলো তথ্য, অ্যাডভেঞ্চারের তীব্র আকর্ষণ আর বালকের মতো সারল্য। বাংলাদেশের ছেলেছোকরারা গোগ্রাসে গেলে তাঁর গল্প-উপন্যাস। এমন একটি মজাদার মানুষকে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ফেলুদার টিমে ঢুকিয়ে দিয়ে গোয়েন্দা গল্পে অতিরিক্ত একটি রসের আমদানি করলেন সত্যজিৎ, তার নাম হাস্যরস।

পাঠকদের মনে পড়বে সেই দেবীকুণ্ডের বর্ণনা, যেখানে রাজপুত যোদ্ধাদের স্মৃতিস্তম্ভ দেখতে যায় লোকে। এইরকম স্মৃতিস্তম্ভ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বিরাট এলাকা জুড়ে— সংখ্যায় অন্তত পঞ্চাশটা। জায়গাটা গাছপালায় ভর্তি, এ গাছ থেকে ও গাছে ফুরত ফুরুত করে উড়ে বেড়াচ্ছে টিয়ার দল। কিন্তু ডক্টর হাজরা কোথায়? আর কোথায়ই- বা মুকুল? এমন ভাবতে ভাবতে লালমোহনবাবুর দিকে তাকাল তোপশে— 'কিছু বলবেন?' চোখ ছোটো করে লালমোহনবাবু বলে উঠলেন, 'বুঝলে ভায়া, ভেরি সাসপিশাস অ্যান্ড মিস্টিরিয়াস!' কিশোর কাহিনি লিখতে বসেছেন সত্যজিৎ। তারই টানে গল্পের এক অনিবার্য চরিত্র হয়ে উঠেছিল তপেশ ওরফে তোপশে। তপেশ হয়তো সত্যজিতের কিশোর-প্রিয় লেখক সত্তারই খানিকটা অংশ। জটায়ু যখন এই দলে এসে ভিড়ল, তারপর

থেকেই চোখে পড়তে লাগল রহস্য আর রহস্যভেদের গুরুগম্ভীর কাহিনির ফাঁক দিয়ে হঠাৎ-হঠাৎ ঝলসে উঠছে হাসির রোদ্দুর।

জয়সলমিরের দুর্গকে ঘিরে থাকা এই রহস্য কাহিনিতে রাজস্থানেরই-বা কত রূপ। কলকাতা থেকে ট্রেনে চেপে আগ্রা হয়ে যোধপুর। যোধপুর থেকে মোটরে বিকানীর। সেখান থেকে আবার মোটরে জয়সলমির মরুভূমির মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ গাড়ি বিকল। আর কোনও উপায় না দেখে পরের বাহন তিন-চারটে উঠ। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর চোখে পড়ল ছোট্ট একটা স্টেশন। সেই স্টেশন থেকে ছোটো লাইনের ট্রেনে চড়ে জয়সলমির। পুরো পথটাই সবাইকে জমিয়ে রাখার দায়িত্ব যেন নিজে থেকেই কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন নবাগত লালমোহনবাবু। কখনও তিনি চোখ বড়ো করে মন্তব্য করেছেন। কখনও উটের পিঠে চড়ে উল্লাসে আত্মহারা। কখনও আবার চিৎকার করছেন উঠের পিঠ থেকে পড়ে যাবার ভয়ে। সব মিলিয়ে মূর্তিমান এক বিনোদন।

এই সেই প্রাচীন কেল্লা যার বিশাল শরীরের আনাচে-কানাচে এখনও বাস করে কয়েকশো স্থানীয় মানুষ। সরু শান বাঁধানো পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কানে আসে দু'পাশের এ-ঘর ও-ঘরের মহিলারা নিজেদের মধ্যে অলস আলাপ করছে। মাঝের রাস্তা দিয়ে কে-যাচ্ছে না-যাচ্ছে তা নিয়ে একটুও মাথাব্যথা নেই কারোর। কেল্লা থেকে বেরিয়ে দূরে গিয়ে দাঁড়ালে বিস্ময়ে দম বন্ধ হয়ে আসে। বিকেলের হেলে পড়া সূর্যের আলো হলুদ বেলে পাথরের গায়ে পড়ে ঠিকরে বেরোচ্ছে উজ্জ্বল সোনা। ঠিক যেন সোনার তৈরি অলৌকিক কেল্লা।

ষড়যন্ত্র, সোনার কেল্লা আর মুকুল। ছোট্ট মুকুল থাকে কলকাতায় আর পাঁচটা আটপৌরে শহুরে পরিবারের সন্তানের মতোই। মাত্র মাস দুয়েক আগে সে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে, কোনও এক সোনার কেল্লায় সে থাকত তবে সেই কেল্লা ঠিক কোথায় তা সে জানত না। আলো-আঁধারি প্রহেলিকার মতো মনে পড়ে— একটা দুর্গ, যে কোনও দুর্গ নয় একটা বিশেষ দুর্গ, যেখানে বালি আছে, অনেক বালি। সব কেমন যেন স্বপ্ন-স্বপ্ন, তবে কি ওর মনটা পড়ে আছে সোনার কেল্লায়? কোন্ জন্মের স্মৃতি উস্‌কে উঠছে তার ছোট্ট মাথায়? সে কি তবে জাতিস্মর?

আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ হিসাবে সত্যজিৎ রায় জাতিস্মরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন কী করতেন না, সেটা বড়ো প্রশ্ন নয়। তাঁর প্রধান পরিচয় তিনি একজন সৃষ্টিশীল মানুষ। একজন ক্রিয়েটিভ লোকের যা ধর্ম, নিজের সৃষ্টির স্বার্থে সমস্ত সম্ভাব্য উপাদানকেই তিনি প্রয়োজনে টেনে আনেন। কখনও এমন ভাবেন না, এই উপাদান বাস্তবসম্মত বা বিজ্ঞানসম্মত নয়, তাই একে ব্যবহার করা যাবে না। গল্পের যা লজিক, তার সঙ্গে সেগুলো খাপ খায় কি না একমাত্র বিবেচ্য সেটুকুই। সোনার কেল্লা যখন গল্প হিসেবে তিনি লিখছেন, তখন গল্পের ন্যারেটিভ, ডায়ালগ, চরিত্র, আবহ সব কিছুই তৈরি হচ্ছে গল্পের শর্ত মেনে। শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে গড়ে তোলা হচ্ছে সেই জগৎ। কিন্তু পরে যখন সোনার কেল্লা সিনেমা হলো, শব্দের বদলে নির্মাণের দায়িত্ব নিয়ে নিল ক্যামেরা। শটের পর শট জুড়ে ক্রমশ জেগে উঠল আরেক জগৎ, গল্পের জগতের চেয়ে যার আকর্ষণ কোনও অংশে কম নয়। এখানেও মুকুল, এখানেও ডক্টর হাজরা, ফেলুদা-তোপশে-জটায়ুর সমবেত রহস্য-সন্ধান। তারই পাশাপাশি সবাইকে ছাপিয়ে পর্দাজুড়ে জেগে রয়েছে সুপ্রাচীন সোনার কেল্লা। রহস্য, অপরাধ, মরুভূমি, জাতিস্মর, জটায়ুর কাণ্ডকারখানায় চলকে ওঠা হাস্যরস— সিনেমাতে সবকিছু মজুত। অতিরিক্ত যা আছে, তা হলো অনবদ্য ভিস্যুয়াল আর শব্দ মেপে মেপে তৈরি করা চিত্রনাট্য। সত্যজিৎ জানতেন, নির্ভার গদ্যের ছোটো ছোটো বাক্যবন্ধে যে চিত্রনাট্য তিনি লিখে রাখছেন, শটের পর শট জুড়ে তাকে যখন গেঁথে তুলবেন, মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যাবে হলভর্তি মানুষ। একই ব্যক্তি যদি লেখক এবং চলচ্চিত্রকার দুইই হন, সাহিত্য পাঠক বা সিনেমা রসিকদের কাছে তাঁর আকর্ষণ দ্বিগুণ হতে বাধ্য। যেমন হয়েছে 'খগম' কিংবা ফটিকচাঁদের। সাহিত্যের শরীরে কীভাবে প্রবেশ করছে সিনেমার উপাদান, এই দুটো গল্প যেন তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। বিনা কারণে পাথর ছুঁড়ে ইমলিবাবার পোষা সাপ মেরে ফেলেছিলেন 'খগম'-এর ধূর্জটিবাবু। সাধুবাবা শাপ দিয়ে বলেছিলেন, একটা বালকিষণ গেছে তো কী হয়েছে, আরেকটা বালকিষণ আসবে। বালকিষণের মৃত্যু নেই, সে অমর। পাঠক এরপর হতভম্ব হয়ে লক্ষ্য করেন, ক্রমশ সাপ হয়ে যাচ্ছেন ধূর্জটিবাবু। তাঁর হাতে-মুখে চাকা চাকা দাগ, শরীর বরফের মতো ঠাণ্ডা, চোখের পাতা পড়ছে না, জিভটা বার কয়েক ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরল। বাবা ডাকলেন বালকিষণ, বালকিষণ! তাই শুনে ভদ্রলোকের হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল। তারপর শরীরটাকে সামনে এগিয়ে দিয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে হেঁচড়ে হেঁচড়ে খাটের তলায় অন্ধকারে চলে গেলেন।

কে ইনি? ধূর্জটি বসু, না দ্বিতীয় বালকিষণ? দ্বিতীয় বালকিষণ কি সাপ না মানুষ? ধূর্জটিবাবু সাপ হয়ে গর্তে ঢুকলেন আর তাঁর মনুষ্য দেহটা খোলস হয়ে ঝুলতে লাগল ইমলিবাবার কুটিরের দড়িতে। সেই খোলসের ওপর রুহিতন মার্কা নকশা। ঠিক যেমন জাত কেউটের হয়!

চুল খাড়া হয়ে ওঠা এই গল্পের শেষ তিন লাইন লিখেছেন সত্যজিৎ : 'ওই যে তার শিস শুরু হলো। ওই যে সূর্য ডুবল। ওই যে ইমলিবাবা ডাকছে--- বালকিষণ...বালকিষণ...বালকিষণ...।'

এরপর ফটিকচাঁদ। সাহিত্যের উপাদানের সঙ্গে সিনেমার উপাদান মিশিয়ে দিলে শব্দের শক্তি কীভাবে হয়ে ওঠে অ্যারিফ্লেক্স ক্যামেরার লেন্স, তা বুঝতে একটা দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। পাঠকের মনে পড়বে মনুমেন্ট ময়দানে সেই রোববারের বিকেল। হারুনের সঙ্গে খেলা দেখতে এসেছে ফটিকচাঁদ।

রোজ সকালে এত ভিড় হয় এখানে? ফটিক বলল।

ওনলি সানডে। চ, তোকে দেখাচ্ছি। বলল হারুন।

সত্যি, ব্যাপার একটা ঘটছে বটে এই মনুমেন্টের মাঠে। চোখ-কান-মাথা সব একসঙ্গে ধাঁধিয়ে গেল। একদিকে কেবল ফেরি হচ্ছে— দাঁতের মাজন, দাদের মলম, বাতের ওষুধ, চোখের ওষুধ, শেকড়-বাকড় আরও কত কী। একজায়গায় টিয়াপাখি বলে দিচ্ছে লোকের ভাগ্য। একটা লোক কথার তুবড়ি ছেড়ে সাবান বিক্রি করছে; তার দু'হাতে গোলাপি সাবানের ফেনা। একটা ভীষণ ময়লা কাপড় পরা পাগলা গোছের লোক কালো আর সাদা খড়ি দিয়ে আশ্চর্য সুন্দর দেব-দেবীর ছবি আঁকছে। লোকজন চারপাশ থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে পয়সা ফেলছে। সেগুলো ঠং ঠং করে হনুমানের ল্যাজে, রামচন্দ্রের মুকুটে, রাবণের মাথার ওপর পড়ছে। লোকটা চেয়েও দেখছে না।

ফটিকের অভিভূত দৃষ্টি দেখে হারুন গম্ভীর গলায় বলল : এখানে কেউ মরতে আসে না রে ফটকে, এখানে আসে বাঁচতে। অভ্যাসে যে কত কী হয়, সেটা খালিফা হারুনের খেলা দেখলে বুঝবি।

(লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং গবেষক)

কবির স্বপ্ন এবং স্বপ্নে পাওয়া কবিতা

মালিনী চট্টোপাধ্যায়

মানুষ বহু যুগ ধরে নিজের স্বপ্ন দেখার কারণ সন্ধান করেছে। সে অতীতে ভেবেছে স্বপ্নের মাধ্যমে ভবিষ্যতে কী ঘটতে চলেছে তারই ইঙ্গিত পাচ্ছে। তারপর এলেন সিগমুন্ড ফ্রয়েড। তিনি একটি পুরনো বই কিনেছিলেন। পড়তে গিয়ে নজরে পড়ল একপাশে পেন্সিলে লেখা— 'স্বপ্নের রহস্য ভবিষ্যতে নয়, অতীতে প্রথিত।' ফ্রয়েডের কৌতূহল হলো। অনেক গবেষণার শেষে তিনি দেখলেন— সত্যিই অতীত অভিজ্ঞতাই অন্য রূপ ধরে স্বপ্নে ফিরে আসে।

তবু বিস্ময় জাগে যখন স্মরণ করি বহু বিশ্ববিশ্রুত কবি, নাট্যকার ও গল্পকার স্বপ্ন দেখে উপহার দিয়েছেন অনবদ্য রচনা। শেলি পত্নী মেরি শেলির 'ফ্রাঙ্কেস্টাইন' উপন্যাসটির কাহিনি স্বপ্নলব্ধ।

কোলরিজ তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ক্রকশ্যাঙ্কের একটি স্বপ্ন অবলম্বনে 'রাইম অব অ্যানসিয়েন্ট মেরিনার' কবিতাটি রচনা করেন। ক্রকশ্যাঙ্ক স্বপ্নে একটি জাহাজের কঙ্কাল দেখেছিলেন। সে জাহাজে বহু নাবিক। স্বপ্ন অবলম্বনে কবিতা, তাই কবিতাটির সর্বাঙ্গে স্বপ্নের অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। স্বপ্নের মতোই ঘটনাগুলি আকস্মিকভাবে ঘটে চলেছে। স্বপ্ন শেষে যেমন মনে হয় যা দেখলাম তা স্বপ্ন না সত্যি, এ কবিতা পাঠ করে পাঠকেরও প্রশ্ন জাগে, এ কবিতার কাহিনি সত্য না স্বপ্ন?

নিজের দেখা স্বপ্ন নিয়েও কোলরিজ কবিতা রচনা করেছেন। কুবলা খান বিষয়ক একটি বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েন কোলরিজ। শেষ লাইনটি ছিল— 'কুবলা খান সেখানে প্রাসাদ নির্মাণের আদেশ দিলেন।' স্বপ্নে ছন্দবদ্ধ অবস্থায় কবিতার একের পর এক চরণ কবির মনে এসে যায়। তিনি ঘুম ভেঙে উঠেই কবিতাটি রচনায় প্রবৃত্ত হন। অপূর্ব সে কবিতা :

"In Xanadu, did Kubla Khan,
A stately pleasure dome decree,
Where Alphs, the Sacred river runs,
Through Caverns measureless to man,
Down to a Sunless Sea."

কবিতাটি অর্ধেক রচনার পরই কোলরিজের এক পরিচিত ব্যক্তি কবির সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তাঁর সঙ্গে কথোপকথন শেষে কবি দেখলেন, কবিতার অবশিষ্ট চরণগুলি আর মনে পড়ছে না। তাই কবিতাটি অসম্পূর্ণ। বস্তুত যত সহজ ভাবে এ কবিতা কবির কাছে ধরা দিয়েছিল সত্যই অত সহজ ছিল না ব্যাপারটা। এ স্বপ্ন দেখার পূর্বে কবি দীর্ঘদিন কবিতা রচনা করেছেন। নিজের ভাবনাকে ছন্দবদ্ধ রূপে প্রকাশ করে সৌন্দর্যসৃষ্টির কৌশল আয়ত্ত করেছেন। স্বপ্নের মধ্যেও কাজ করে গেছে কবির কবিতা রচনার সেই পুরনো অভিজ্ঞতা, শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'নির্মাণ ও সৃষ্টি' প্রবন্ধে বলেছেন, 'একদিন যখন তাঁর আত্মপরিচয়ে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, কবিতা লেখার একজন কর্তা কবিকে অতিক্রম করে লিখে যান সব লেখা, তখন সেই সহজ কথাটা বুঝতে দ্বিজেন্দ্রলালের মতো মানুষদের কষ্ট হয়েছিল খুব।

কেয়ার্ডের নজির টেনে সেদিন রবীন্দ্রনাথকে বোঝাতে হয়েছিল আমাদের সচেতন আর অবচেতন অস্তিত্বের ভিন্নতা। বোঝাতে পারতেন হয়তো ম্যাথু আর্নল্ডের কবিতা থেকেও, যে কবিতায় আর্নল্ড লেখেন :

"there flows
with noiseless current strong, obscure and deep
The central stream of what we feel indeed."

বস্তুত যে কোলরিজ কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে ওয়ার্ডসওয়ার্থের সঙ্গে আলোচনায় স্থির করেন তিনি অলৌকিক কাহিনি ও চরিত্র নিয়ে কাব্য রচনা করবেন, যে চরিত্ররা আমাদের হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে আগ্রহ জাগিয়ে তুলবে। যার ফলে স্বেচ্ছায় সব সংশয়কে ক্ষণকালের জন্য রোধ করে কাব্য উপভোগ করব আমরা, সেই কোলরিজের পক্ষেই এমন স্বপ্ন দেখা সম্ভব। কবির অবচেতন মন স্বপ্নেও কবিতা রচনা করে গেছে।

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'গুপ্তধন' গল্পটির কথা মনে পড়ে। মৃত্যুঞ্জয় বহুবার পড়েও যে ধাঁধার সমাধান করতে পারেনি, স্বপ্নে অতি সহজে পেয়ে গেল তার উত্তর। 'পায়ে ধরে সাধা/রা নাহি দেয় রাধা/শেষে দিল রা,/পাগোল, ছাড় পা।' এ ধাঁধার উত্তর ধারাগোল নামের গ্রাম। এখানে উল্লেখযোগ্য মৃত্যুঞ্জয় পূর্বে কখনও ধাঁধাটি সমাধান করার চেষ্টা করেনি। সে শুধু পুজো করত, তারপর ধাঁধা লেখা কাগজটি প্রণাম করে যথাস্থানে রেখে দিত। তার বিশ্বাস ছিল সমাধানের প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই, দৈবকৃপায় সে একদিন ধাঁধার রহস্য উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হবে। কারণ যে সন্ন্যাসী ধাঁধা লেখা কাগজটি দিয়েছিলেন তিনি বলেছিলেন, তাদেরই বংশের কেউ এর রহস্য বুঝবে। ধাঁধা লেখা— কাগজটি হারানোর পর থেকে মৃত্যুঞ্জয় মনে মনে ধাঁধাটির বিষয়ে চিন্তা করতে শুরু করে। বারংবার পড়ার ফলে ধাঁধাটি তার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। তার অবচেতন মন স্বপ্নে ধাঁধার সমাধান করে দেয়। আমরা অনুমান করতে পারি রবীন্দ্রনাথের জীবনেও অনুরূপ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তাই মৃত্যুঞ্জয়ের স্বপ্নের মাধ্যমে ধাঁধার সমাধানের বিবরণ এত জীবন্ত ও বিশ্বাসযোগ্য ভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ রচিত মালিনী নাটকের কাহিনিও স্বপ্নলব্ধ। স্বপ্নলব্ধ কাহিনির সারা অঙ্গ নিজস্ব চিন্তাধারার অলংকার দিয়ে সাজিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। রচনার বিষয়, চরিত্র, আঙ্গিক ও ভাষা নিয়ে ভাবাই যাঁদের দিবারাত্রির কাব্য, তাঁদেরই অবচেতন মন রচনার উপাদান স্বপ্নে পেয়ে যায়।□

মিঠুনকে অপমান করার আগে মানুষটাকে চিনুন

বরুণ মণ্ডল

পশ্চিমবঙ্গের পরিবর্তনের পরিবর্তন শুরু হয়ে গেছে। দলে দলে শাসকদল তৃণমূল থেকে নেতা-নেত্রীরা ভাবী শাসকদল ভারতীয় জনতা পার্টিতে নাম লেখাচ্ছেন। ঐতিহাসিক ব্রিগেড সমাবেশে বাঙ্গলার জনপ্রিয় এবং দেশের কৃতীসন্তান গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী ওরফে মিঠুন চক্রবর্তী বিজেপিতে যোগ দিলেন।

৭ মার্চ কলকাতা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মিঠুন।

রাজনীতির ক্ষেত্রে মোদীজী এবং অমিত শাহের এটা একটা মাস্টার স্ট্রোক বটে। তবে বিরোধীরা বসে নেই, তারাও সমালোচনার অস্ত্রে শান দিচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত কয়েকটা মতামত দেওয়ার জন্য আজকের কলম ধরা।

হ্যাঁ ঠিক কথা, উনি বার বার রাজনীতির আঙিনায় এসেছেন। নকশাল থেকে সিপিএম। সেখান থেকে তৃণমূল কংগ্রেসে। আজ আবার ভারতীয় জনতা পার্টিতে। কিন্তু বারবার রাজনীতি থেকে পালাতে হয়েছে। কারণ পূর্বের সমস্ত রাজনৈতিক দল তাঁকে ব্যবহার করেছে, তাঁর আদর্শ ও স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করেনি। তাঁর গ্ল্যামার জগতের ক্যারিশমাকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চেয়েছেন জ্যোতি বসু, সুভাষ চক্রবর্তী, সোমেন মিত্র থেকে মমতা ব্যানার্জি।

শুধু ভালো ভালো সিনেমা উপহার নয়, বাঙ্গালি হয়ে হিন্দি সিনেমা জগতে একছত্র রাজ করা নয়, অভিনয়ে মুগ্ধ করে ভারতবর্ষের সেরা পুরস্কারগুলো জিতে নেওয়া নয়, সাধারণ বাঙ্গালি হয়েও দেশের তথা বাঙ্গলার আইকন হওয়া নয়, পথের শিশুকে পিতৃস্নেহে মানুষ করা নয়, বাঙ্গলার বিকিয়ে যাওয়া মিডিয়াকে শিক্ষা দেবার জন্য উনি 'খবরের কাগজ' নামে একটি সংবাদপত্রও তৈরি করেছিলেন। যার হেড অফিস ছিল কলকাতার দক্ষিণদাঁড়িতে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে কাজ দেওয়ার জন্য ডিটারজেন্ট (যে ডিটারজেন্ট পাউডারের নাম দিয়েছিলেন 'খুশি' এবং 'পাখি'), সাবান প্রভৃতি উৎপাদনের ছোটোখাটো ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করেছিলেন কলকাতার দক্ষিণদাঁড়ি রোড এলাকায়। কিন্তু যাদের বিশ্বাস করেছেন তারাই তাঁর টাকা লুটেপুটে খেয়েছে। সাধারণ মানুষ যাদের কাছে তিনি ছিলেন ধরাছোঁয়ার বাইরে অথচ তিনি নেমে এসেছিলেন মাটির মানুষের কাছে মাটির মানুষ হয়ে। কারণ তিনি তাদের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের উন্নয়ন ঘটাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেই সমস্ত মানুষগুলো তাঁর সঙ্গে বেইমানি করেছেন। এখন একদল বলছেন, তাঁর ছেলেরা প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি, করোনা মহামারীতে তাঁর কোনো অবদান নেই ইত্যাদি অভিযোগ। বেইমানদের প্রতি সমস্ত অভিমান দূরে রেখে তিনি কিন্তু করোনাতে বাঙ্গলায় অনেক সহযোগিতা করেছেন। যা প্রচারের আলোকে তিনি আনেননি। তিনি মিঠুন চক্রবর্তী, অন্ধগলি থেকে সত্যিই উঠে আসা এক বাঙ্গালি 'বিগ বস', যিনি বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালিকে সম্মানীয় উচ্চতায় নিয়ে যেতে চান! বাঙ্গালিদের উন্নয়নের অগ্রদূত হতে গিয়ে একদল লুটেরা বাঙ্গালির হাতেই বারবার তার স্বপ্ন ভেঙে খানখান হয়েছে। তথাপি তিনি তাঁর স্বপ্ন থেকে একচুল নড়েননি। সবশেষে পশ্চিমবঙ্গের আর সমস্ত জনগণের মতো মমতা ব্যানার্জিকে তিনি সৎ, সাহসী এবং বাঙ্গলার নতুন রূপকার হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন, সেখানেও তিনি ঠকেছেন। যার জন্য তাঁকে প্রবাসে থাকতে হয়েছে দীর্ঘদিন। কিন্তু আজ হাত ধরেছেন নরেন্দ্র মোদীজীর। কেননা আদর্শ এবং দেশ গড়ার কাণ্ডারি হিসেবে নরেন্দ্র মোদী পরীক্ষিত এবং প্রমাণিত। দেশের আমূল রদবদল হয়তো তিনি করতে পারেননি কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত দুর্নীতির কোনো কালিও লেপন করতে পারেনি হলুদ সাংবাদিকরা। অথচ আর সমস্ত রাজনৈতিক দলের সামান্য পঞ্চায়েত সদস্যরাও দুর্নীতিতে আপাদমস্তক ডুবেছে। একরাশ ক্ষোভ এবং মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে আদর্শ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ভেঙে বাঙ্গলা থেকে বহুদূরে চলে গিয়েছিলেন, আবার ফিরলেন নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে। এবার অবশ্যই তাঁর স্বপ্ন পূরণ হবে। তিনি রাজনীতিতে এলে বাঙ্গলার অর্থনৈতিক বা প্রশাসনিক পরিবর্তন কতটা উন্নতি হবে সেটা ভবিষ্যতে বলবে। তবে পশ্চিমবঙ্গে যে অপশাসন চলছে, দুর্নীতি ও কাটমানির রাজত্ব চলছে, মা-মাটি-মানুষের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে ছেলে খেলা চলছে— তার অবসান ঘটাতে রাজনৈতিক পরিবর্তনের যে পরিবর্তন হতে চলেছে সেই জোয়ারের পালে হাওয়া লাগাতে মিঠুন চক্রবর্তীর কারিশমা যথেষ্ট সাহায্য করবে, যা মিঠুন চক্রবর্তীর স্বপ্ন পূরণেও অনেকটাই সহায়ক হবে। □

মা-মাটি-মানুষের সরকারে—মা-এর অবস্থান

আমরা সবাই জানি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত আইন অনুসারে মায়েদের সামাজিক সশক্তিকরণের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদে কিছু আসন সংরক্ষিত আছে। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে সংরক্ষিত আসনে যে সকল মায়েরা অংশগ্রহণ করে নির্বাচনে জয় লাভ করেন তাঁরা কিন্তু সামাজিক কাজে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। পঞ্চায়েত 'সদস্যা-পতি' কিংবা পঞ্চায়েত 'প্রধান-পতি' অর্থাৎ তাঁদের স্বামীরাই 'সদস্যা' কিংবা 'মহিলা প্রধান'কে বঞ্চিত করে নিজেরা সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন সামাজিক কাজের অছিলায়। এমনকী দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর মহিলা অঞ্চল-প্রধানের কার্যালয়ে 'স্ত্রীর সরকারি আসনে' আলো করে বসে স্বামিত্বের গর্বে গর্বিত হয়ে সমস্ত প্রকার সরকারি নথিপত্রে স্বাক্ষর করে থাকেন সম্পূর্ণ বেআইনি ভাবে। বলা বাহুল্য, প্রধানত শাসকদলের দ্বারাই এই ব্যবস্থা বলবৎ আছে। সাধারণ নাগরিক সবকিছু জেনে-বুঝেও কিছু বলতে সাহস পান না, কারণটা নাই-বা বললাম। সবাই অবগত আছেন। এখন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক : (১) সরকারি ব্যবস্থাপনায় নিয়ামক আধিকারিক কি এ ব্যাপারে অজ্ঞাত আছেন? না তিনিও জনগণের মতো নিরুপায়? (২) এই ব্যবস্থা কি বাস্তবিক অর্থে মাতৃশক্তির সশক্তিকরণ? না প্রহসন? (৩) এটা কি সরকারের অগোচরে হয় না সরকারের বদান্যতায়? এবং (৪) এটা কি ভারতীয় সংবিধানের সঙ্গে তঞ্চকতা নয়? এ দৃশ্যপট দেখে, শ্রীমদভাগবত মহাপুরাণের কলির দ্বারা 'প্রহৃতা' ও 'অত্যাচারিতা' গাভীরূপী 'পৃথিবীর' কথা আজ বারে বারে মনে পড়ে।

—তপন কুমার বৈদ্য,
দমদম, কলকাতা-৭৪।

একি আজব কারখানা

খেলা শুরু হয়েছে কয়েকমাস হয়ে গেল। কৃষি বিল নিয়ে তুমুল লড়াই বেধেছে সরকার বনাম কৃষক সংগঠনের। সরকার বলছে, কৃষকের কল্যাণের জন্য এই বিল পাশ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে কৃষক সংগঠন বলছে, কৃষকদের সর্বনাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দুই পক্ষে মিলিত বৈঠক হয়েছে অনেকবার। মীমাংসা হয়নি। বৈঠক আরও হবে। কিন্তু কতবার হবে এবং হলে তাতে নিষ্পত্তি হবে কিনা ঈশ্বর জানেন। এর মধ্যে থেকে সংগঠন তাদের বিক্ষোভ বন্ধ করেনি এবং তাতে কিছু মৃত্যু ও আহতের সংবাদ শুনছি। বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ হয়েছে বলেও খবর আছে। বাদী-বিবাদী দুই পক্ষ দুই মেরুতে। কোনপক্ষের দাবি সত্যতার বিচার করবে কে? দেশে বিচার বিভাগ বলে একটি তৃতীয় পক্ষ বিদ্যমান। কোনপক্ষের দাবি সত্য নির্ণয়ের দায় সেই বিভাগের। কিন্তু প্রকৃত সত্যের দাবিদার পক্ষ কেন ন্যায়দণ্ডধারীর শরণাপন্ন হচ্ছে না বোঝা মুশকিল। ন্যায়শাস্ত্র মতে দুটি পরস্পর বিরোধী কথা একই কালে সত্য হতে পারে না। মধ্যপ্রাচ্যের বিশ্বখ্যাত নসরুদ্দিন হোকার গল্প মনে পড়ছে। তিনি একসময় কাজি ছিলেন। একটি মামলার বিচারে তিনি বাদীকে বলছেন, তোমার কথা সত্য। বিবাদীর কথা শুনে তাকেও বলছেন, তোমার কথাও সত্য। অখন পেশকার চুপি চুপি তাঁকে বলছেন, হুজুর, উভয়পক্ষের বিরুদ্ধদাবি সত্য হতে পারে না। কাজি অবিলম্বে পেশকারকে বলছেন, তোমার কথাও সত্য। আমাদের মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

—কমলাকান্ত বণিক,
দত্তপুকুর, উত্তর ২৪ পরগনা।

কাশ্মীরে উগ্রপন্থী সমর্থকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক

সংবাদে প্রকাশ, সংসদ হামলার ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত আফজল গুরুর ফাঁসির অষ্টমবর্ষ পূর্তিতে কাশ্মীর বনধ পালিত হয়েছে। উল্লেখ্য ২০১৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি দিল্লির তিহার জেলে এই কুখ্যাত উগ্রপন্থীর ফাঁসি হয়। ওইদিন কাশ্মীরে সমস্ত দোকানপাট, পেট্রোলপাম্প, যানবাহন বন্ধ ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের নিকট আমার অনুরোধ, ওইদিন যারা দোকানপাট বন্ধ রেখেছে এবং ধর্মঘট পালন করেছে তারা যাতে আর কোনোদিন ওই দোকান না খুলতে পারে তার ব্যবস্থা করা এবং বনধ সমর্থনকারী ওই গদ্দারদের পাকিস্তানে পুশব্যাক করা হোক। জম্মু-কাশ্মীরে ৭০ লক্ষ মুসলমানকে বাগে রাখতে ৭ লক্ষ সৈন্য মোতায়ন রাখা হয়েছে। যা পৃথিবীর উগ্রপন্থী দমনে সেনা মোতায়নের সর্বোচ্চ সংখ্যা। দেশের বর্তমান যা অবস্থা তা দেখে মনে হয় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ঠিকই বলেছিলেন, 'এ দেশে একজনই জাতীয়তাবাদী মুসলমান আছেন তার নাম জওহরলাল নেহরু।'

—রবীন্দ্রনাথ দত্ত,
কলকাতা-৬৪।

কু-ভাষার রাজনীতি

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা-সহ পাঁচ রাজ্যের ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশিত হয়েছে। জোরকদমে চলছে শাসকদল ও বিরোধী দলের জনসভা ও প্রচার। শাসকদল চাইছে পুনরায় ক্ষমতায় আসতে আর বিরোধী দলগুলো চাইছে পরিবর্তনের পরিবর্তন ঘটিয়ে শাসকদলের বিদায় ঘণ্টা বাজাতে। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের সংবিধান অধিকার দিয়েছে নিজ নিজ রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড জনসমুখে তুলে ধরা এবং রাজনৈতিক ভাবে বিরোধীদের গঠনমূলক সমালোচনা করা। কিন্তু প্রচার যতই এগোচ্ছে ততই যেন পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দলগুলো তাদের শালীনতাবোধ, ভদ্রতা, শিষ্টাচার সব জলাঞ্জলি দিয়ে একে অপরকে বিদ্ধ করছে অ-কথা, কু-কথার বাণে। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সভ্যতা সবকিছুকে পদদলিত করে কু-কথার লড়াই জারি রেখেছে রাজনৈতিক দলের নেতা ও

নেত্রীবৃন্দ। এই ব্যাপারে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস বা এই মুহূর্তে প্রধান বিরোধীদল বিজেপি-সহ সিপিআইএম, কংগ্রেস এবং নবনির্মিত তথাকথিত সেকুলার দল আইএসএফ কেউ-ই নিজেদেরকে কু-কথার বাইরে রাখতে পারছে না এবং কে কত খারাপ ভাষা প্রয়োগ করতে পারে তার একটা ইঁদুর দৌড় শুরু হয়েছে।

যেমন--- আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়, 'তুমি কোন হরিদাস পাল হে 'বা' তুমি বহিরাগত, নাড্ডা ফাড্ডা চাড্ডা।' বা 'দিল্লি থেকে এল দুই ভাই জগাই আর মাধাই। একজন হলো হুদুল কুতকুত আর একজন কিম্ভুতকিমাকার'। আবার তাঁর ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও পিছিয়ে নেই ---'আমি তোর বাড়ির পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যেই আছি। তোর বাপকে গিয়ে বল, দেখি আমার কি করতে পারে।' আবার দিদির দলেরই সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মদন মিত্ররা অবলীলায় ভগবান রামচন্দ্র আর মাতা সীতাদেবীর নামে জঘন্যতম কু-ভাষা প্রয়োগ করতে পিছুপা হচ্ছে না।

২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৎকালীন সিপিআইএম সাংসদ অনিল বসুর সেই বিখ্যাত কু-ভাষা তৎকালীন বিরোধী দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্কে করেছিলেন তার জবাব পশ্চিমবঙ্গের জনগণ দিয়েছেন। অনিল বসুর সেই কু-বাণী এখানে আর তুলে ধরলাম না। এই বছরেই আত্মপ্রকাশ করল নতুন রাজনৈতিক দল আইএসএফ। সেই দলের স্বঘোষিত সেকু নেতা আব্বাস সিদ্দিকি ওরফে ভাইজান তারও বক্তব্য খুব একটা সুমধুর নয়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে তার 'সু-ভাষা'— 'এই ডায়মন্ড হারবারের ভাত তোমার ঘুচিয়ে দেব' ইত্যাদি। এই ভাবে ছোটো-বড়ো সব রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা অবিরত কু-ভাষা প্রয়োগ করে চলেছেন একে অপরের বিরুদ্ধে। যা একদম কাম্য নয়।

এখন প্রশ্ন হলো ওনাদের মতো শিক্ষিত মান্যবর নেতা-নেত্রীরা যদি এই ভাবে কুরুচিকর ভাষায় একে অপরকে আক্রমণ করেন তাহলে বর্তমান প্রজন্ম কী শিখবে? আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে বর্তমান যুগ সোশ্যাল মিডিয়া ও টেলিভিশনের যুগ। যার দৌলতে সমস্ত কিছু মুহূর্তের মধ্যে আমাদের কাছে চলে আসে। যা বর্তমান প্রজন্ম ভালো করে খেয়াল করে। যা শুনে এই প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা অনায়াসে প্রশ্ন করতে পারে, 'ওনারা শিক্ষিত হয়ে এই ধরনের ভাষা কেন প্রয়োগ করেন?' যাদের উপর আমাদের দেশ তথা রাজ্যের দায়িত্ব নিহিত হবে তাদের মুখের ভাষা কি আরও উন্নত হওয়া উচিত নয়? তাই সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির নেতা-নেত্রীর কাছে অনুরোধ নিজ নিজ ভাষায় একটু লাগাম টানুন। পশ্চিমবঙ্গের চিরায়ত সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে রক্ষা করুন।

—নরেশ মল্লিক,
পূর্বস্থলী, পূর্ব বর্ধমান।

ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট

পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতির আকাশে আবার কালোমেঘ ঘনীভূত হচ্ছে। মুসলিম লিগ আবার শক্তি সঞ্চয় করছে। নেতৃত্বে রয়েছে ফুরফুরা শরিফের পিরজাদা আব্বাস সিদ্দিকি। সহযোগী হিসেবে রয়েছে হায়দরাবাদের কুখ্যাত অল ইন্ডিয়া মুসলিম ইত্তেহাদুল মুসলমিনের আসাদুদ্দিন ওআইসি। ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি দিলীপ ঘোষ উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন চার পাঁচ হাজার রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীর নাম পশ্চিমবঙ্গে ভোটার লিস্টে উঠে গেছে। নিশ্চিতভাবে বলা যায় এইসব অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গা ভোটাররা অবশ্যই আইএসএফ-কেই ভোট দেবে। তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও লাভ হবে না। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গবাসীরা সম্ভবত ১৯৪৬ সালের গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংসের বীভৎস দিনগুলির কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়েছে। ১৯৪৬ সালের ১৬, ১৭, ১৮ আগস্ট ৩ দিনে আনুমানিক ১৬ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। বর্তমান প্রজন্ম সম্ভবত এই বীভৎস দিনগুলির কথা কিছু জানেই না। অর্থাৎ তাদের জানানো হয়নি। গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংসের ২ মাস পরেই ঘটেছিল নোয়াখালী জেনোসাইড। ৬ থেকে ৬০ বছরের কোনও হিন্দু কন্যা বা রমণী রেহাই পায়নি মুসলমান দুষ্কৃতীদের নৃশংস অত্যাচারের হাত থেকে, যুবতী হিন্দু কন্যাগণ একাধিকবার ধর্ষিতা হলেও রেহাই পায়নি। তাদের অপহরণ করা হয়েছিল পরে যাতে বারংবার ধর্ষণ করা যেতে পারে। মৃতের সংখ্যা নির্ধারণ করা সম্ভবপর ছিল না। এছাড়া বাংলাদেশে হিন্দু হত্যা, হিন্দু কন্যা অপহরণ, ধর্ষণ এবং ধর্মান্তরকরণ আকছার ঘটেই চলেছে। হিন্দু সম্পত্তি, দেবোত্তর সম্পত্তি বা শ্মশান দখল করা কোনও ঘটনাই নয়। পশ্চিমবঙ্গ যদি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে তাহলে পশ্চিমবঙ্গেও ওই ধরনের ঘটনা ঘটতেই থাকবে আর দেশের রাজনৈতিক দলগুলি মুসলমান ভোটের লালসায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলবে না। ফলে উৎসাহিত হয়ে উঠবে মুসলমানরা। তাদের অত্যাচারের ঘটনা দিনকে দিন বৃদ্ধি পেতে থাকবে। বর্তমানে দেগঙ্গা, ধুলাগড়, উস্থি, নলিয়াখালি, বাদুড়িয়া, বসিরহাট, কালিয়াচক প্রভৃতি অঞ্চলে হিন্দুরা যেভাবে মুসলমান দুষ্কৃতীদের দ্বারা নিগৃহীত হচ্ছে, অত্যাচারিত হচ্ছে, হিন্দুদের দোকান লুট হচ্ছে, বাড়িঘর ভাঙচুর করা হচ্ছে, হিন্দু মহিলাদের শ্লীলতাহানি করা হচ্ছে, হিন্দু কন্যাগণ অপহৃতা হচ্ছে, ধর্ষিতা হচ্ছে, ধর্মান্তরিতা হতে বাধ্য হচ্ছে। ফুরফুরা শরিফের পিরজাদা আব্বাস সিদ্দিকির নয়া দল 'ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট' সবে অঙ্কুরিত হয়েছে। এটা যেদিন মহীরুহে পরিণত হবে সেদিন পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের অবস্থা হবে ১৯৪৬ সালের গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস এবং নোয়াখালি জেনোসাইডের ঘটনাবলীর মতো। কারণ কোরানের প্রধান বক্তব্যই হচ্ছে সমস্ত পৃথিবীটা হচ্ছে আল্লার সাম্রাজ্য। এখানে সর্বত্র আল্লাহর শাসন ব্যবস্থা 'শরিয়তি' চালু করতে হবে ও সবাইকে ইসলাম কবুল করতে হবে। যে ইসলাম কবুল করতে অস্বীকার করবে তার একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। অতএব হিন্দুরা সাবধান হোন।

—শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,
ডেজিরে কমপ্লেক্স, চন্দননগর।

অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়লে কী করবেন

বৃষ্টি মজুমদার

আপনি কি জানেন যে, তিন বছর বয়স থেকেই এই বিব্রতবোধ করার অনুভূতিটা আসে। বছর তিনেকের কোনও শিশু কিছু ভুল করলে তাকে সেটা ধরিয়ে দেওয়া হলে সে লজ্জা পায়, অনেক সময়ে আবার সংকোচবোধও করে। বিব্রত হওয়ার শুরু তখন থেকেই। সে নোংরা পোশাকই হোক বা এলোমেলো চুল, খারাপ টিফিন সব কিছুতেই খারাপ লাগার শুরু তখন থেকেই।

তবে স্কুলের এইসব ঘটনা তরুণ জীবনের তুলনায় নেহাতই ছোটোখাটো। এই সময়ে সকলেই খুব আত্মসচেতন হয়ে ওঠে। তার সম্বন্ধে কে কী ভাবল, তার ইমেজ কেমন হলো সবার কাছে— এই সব নিয়ে বেশি সচেতন থাকে। সবাই অবশ্যই সমান নয়। মধ্যবয়স্করা এই ধরনের পরিস্থিতি দারুণ ভাবে সামলে নেন। অথবা তাদের থেকে আরও বয়স্কদের ক্ষেত্রে এই পরিস্থিতিতে কম পড়তে হয়। তাদের তাৎক্ষণিক বুদ্ধিমত্তা আর অভিজ্ঞতা দিয়ে তারা বিষয়টা সামলে নেন। তাই এ রকম অভিজ্ঞ কোনও ব্যক্তির কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়াই আসল কাজ।

ধরুন, একটা অনুষ্ঠান বাড়িতে আপনি গেছেন। যে কোনও কারণেই হোক আপনার পোশাকে সমস্যা রয়েছে বা অবাঞ্ছিত দাগ লেগেছে। আপনি কী লজ্জা কাটাতে সারা সন্ধ্যে বাথরুমে লুকিয়ে থাকবেন? একদম না। এটা সমস্যা সমাধানের পথ নয়। প্রথমেই এটা মনে রাখবেন যে, এ সমস্যা আপনার একার হয়নি। অনেকেরই হয়। তাই আপনারই সমবয়সি কারোর থেকে সাহায্য চান। পরিস্থিতি সামাল দিতে আপনি অন্য কোনও বয়স্ক মহিলার থেকেও সাহায্য চাইতে পারেন। কারণ মহিলারাই মহিলাদের সমস্যা বুঝবে। নিঃসন্দেহে আপনার সমস্যা অন্যেরা বুঝবে।

এমন কোনও ঘটনা যদি আপনার বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে হয় তাকেও আপনি বোঝাবেন। সমস্যাকে ফেস করতে শেখাবেন। তার ভুল বোঝাটাকে প্রশ্রয় দেবেন না। খারাপ পরিস্থিতি থেকে উঠে দাঁড়াতে শেখান।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ঘটনাগুলো আঁকড়ে থাকি আমরা। মন থেকে তা ভুলতে পারি না এবং কষ্ট পেতে থাকি। মানসিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আমরাই মন থেকে সেটা ভুলতে চাই না। এতে কিন্তু আমাদেরই ক্ষতি হয়। মানসিক জটিলতা আরও বাড়ে।

মনকে যদি বাগে রাখতে না পারেন তাহলে প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটান। খোলা জায়গায় কিছুটা সময় হেঁটে আসুন। অথবা নিজের পছন্দের কিছু নিয়ে খানিক সময় কাটান। যদি পরিস্থিতি সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে তাহলে একটু বাইরে কোথাও বেড়াতে যেতে পারেন। ঘটনার রেশ কাটিয়ে মাথার চাপ কমিয়ে, ঘটনাকে ভুলে আপনি ফের স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে পারবেন। তবে মনে রাখবেন, কোনও ছোটো শিশুর সঙ্গে এরকম হলে তাকেও একই পরামর্শ দেবেন। আরও একটা কথা মনে রাখবেন যে, কারও এত সময় নেই যে আপনাকে নিয়ে বা আপনার বিষয় নিয়ে এত মাথা ঘামাবে। সময় সব কিছুই ফিকে করে দেয়। তাই আপনার সঙ্গে সঙ্গে অন্য সবাই এ ঘটনা ভুলে যেতে বাধ্য।

বিব্রত হওয়ার ঘটনা আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে ভাগ করে নিন। তাতে মনের জোর পাবেন। অনেক ক্ষেত্রেই কোনও ঘটনাকে ঘিরে ভুল কিছু ধারণা করে বসে থাকি আমরা। প্রিয়জনরা আপনাকে এবং আপনার সঙ্গে জড়িত সেই ঘটনাকে ভালোই বুঝতে পারবে। এবং সেই সেটা ভেঙে দেবে। এতে অনেক ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝি দূর হয়। হেনস্তার শিকার হলে মুখ গুমরে বসে থাকবেন না, খোলাখুলি কথা বলে বিষয়টি মিটিয়ে নিন। আলোচনা অনেক কিছুকেই সহজ করে দেয়।

নিজেকে নিয়ে অনেকে একটু বেশিই সচেতন। সেটা ঠিক নয়। তাতে বহুক্ষেত্রে হিতে বিপরীত হয়। মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন তাতে সব সময় সেই ব্যক্তি ভাবতে থাকেন, আমাকে নিয়ে ওরা বোধহয় হাসাহাসি করছে বা আমাকে নিয়ে কথা বলছে। তাহলে নিশ্চয়ই আমার ড্রেসটা আজকে খারাপ বা আরও অনেক কিছু ভাবতে বসেন। তাতে অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে আরও বেশি করে পড়তে আপনি বাধ্য। তাই কলেজে, অফিসে অথবা পারিবারিক কোনও অনুষ্ঠানে কখনওই নিজেকে নিয়ে ওভার কনসাস হবেন না। সব সময় স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করুন। আপনি যথেষ্ট সুন্দর, অতিরিক্ত কিছু করার প্রয়োজন নেই। তাই আর আলাদা করে নিজেকে জাহির করার কোনও দরকার নেই। তাতে আপনার অনেক অবাঞ্ছিত সমস্যা দূর হবে। □

টেনশনে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

আধুনিক সভ্যতার নবতম অবদান টেনশন। প্রশ্ন হতে পারে টেনশন কী? লক্ষণ কী? প্রতিকারই-বা কী? মানুষের ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা, কাজ, পারিপার্শ্বিকতা, সামাজিক-রাজনৈতিক-পারিবারিক-অর্থনৈতিক রীতিনীতির প্রেক্ষাপটে তারতম্য ঘটলেই আসে সংঘাত। এই সংঘাতের ফলে মনে একরকম চাপ সৃষ্টি হয়। একেই বলে টেনশন। এই টেনশন মন থেকে শুরু হয়ে শরীরে নানা গণ্ডগোল শুরু করে। যেহেতু ঘটনাটি মনে ঘটে, তাই প্রথমে নাড়া দেয় মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস জোন ও পিটুইটারি গ্ল্যান্ডে। তারপর এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে মস্তিষ্কের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ওপরে এর কুপ্রভাব কম নয়। এই স্নায়ুতন্ত্রের আবার দুটি ভাগ—(১) সিমপ্যাথেটিক ও (২) প্যারা-সিমপ্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম। এই প্রধান গ্রন্থিগুলি ও স্নায়ুতন্ত্রের ওপর কুপ্রভাবে ফরেল শরীরে বিভিন্ন হরমোন ক্ষরণে ও ভেতরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিচালনায় গোলযোগ দেখা দেয়। বিপাক ক্রিয়াতেও প্রচুর গণ্ডগোল দেখা দিতে পারে।

টেনশনের লক্ষণ :

(১) ঘাম হতে পারে, (২) মাথার পেছনে ঘাড়ের দিকে একটা গরমভাব থাকতে পারে, (৩) অনেকের গলা জিভ শুকিয়ে আসে, (৪) ঘন ঘন টয়লেট যান অনেকে, (৫) হার্ট ও পালস্ বেড়ে যেতে পারে, (৬) বুক ধড়ফড় করতে পারে, (৭) টেনশনে বদ হজম কিংবা গ্যাস্ট্রাইটিস হয়ে যেতে পারে, (৮) খিদে কমে যেতে পারে, (৯) কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে, (১০) ঘুম কমে যেতে পারে, (১১) বিরক্ত, খিটখিটে, বদমেজাজ হতে পারে, (১২) অস্থিরতা আসতে পারে, (১৩) কেউ অযথা বেশি কথা বলতে থাকেন, (১৪) কেউ-বা চুপ করে যেতে পারেন, (১৫) হাত-পা ঝিমঝিম করতে পারে।

টেনশনের সম্ভাব্য উপসর্গ :

(১) টেনশন থেকে রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে, (২) ব্লাড সুগার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা, (৩) মেয়েদের ঋতুস্রাবে গণ্ডগোল দেখা দিতে পারে, (৪) স্মৃতিশক্তি কমে যেতে পারে, (৫) মস্তিষ্কে সেরিব্রাল মেলারেজ হতে পারে, (৬) ক্রমাগত উচ্চ রক্তচাপ থেকে হার্ট মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন কিংবা ইসকিমিয়া হতে পারে, (৭) রক্তনালিতে চর্বি জমে পেরিফেরাল রেজিস্টেন্স বেড়ে যেতে পারে, (৮) পরের দিকে কিডনির গোলযোগ আসতে পারে, (৯) অতিরিক্ত টেনশনের জন্য অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড থেকে বেশি মাত্রায় অ্যাড্রিনালিন হরমোন ক্ষরণ হলে শরীরে টক্সিসিটির মাত্রা বেড়ে নানা উপসর্গে শরীর ও মন বিগড়ে যেতে পারে।

টেনশনের প্রতিকার হলো সংযত মন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'যা পেয়েছি তা আমার সঞ্চয়, যা পাইনি তা আমার নয়।' তিনি আরও বলেছেন 'বঞ্চিত করে বাঁচালে আমায়।' এই ভাবনায় ভাবিত হলে মনকে সংযত করা সম্ভব। অবশেষে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার সাহায্য নিতে পারা যায়। তবে লক্ষণ অনুযায়ী যে কোনও ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে। কয়েকটি সম্ভাব্য ওষুধের কথা আলোচনা করছি।

আর্জেন্টান-নাইট্রিকাম— যে কোনও কাজে প্রচণ্ড টেনশন। কী হবে কী হবে ভাব। নানারকম অস্বস্তিকর ভাবনায় মাথায় ভিড়। দৈহিক দুর্বলতা ও মানসিক উৎকণ্ঠা। সময় কাটতে চায় না।

জেলসিমিয়াম— প্রচণ্ড নার্ভাস, টেনশনে হাত পা কাঁপতে থাকে। অস্বাভাবিক দুর্বলতা। মনে হয় চলৎশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। স্নায়ুতন্ত্রের অবসন্নতা, মাথা ঘোরে, চিন্তা করার শক্তি লোপ পায়। নিদ্রালুতা, চুপচাপ পড়ে থাকতে ইচ্ছা করে (dullness, diziness, drowsiness) একা থাকতে চায়, কথা বলতে চায় না। অন্যের সঙ্গেও ভালো লাগে না। জলপিপাসা একদম থাকে না।

লাইকোপডিয়া— বুদ্ধিমান, যোগ্যতাসম্পন্ন ও ভীরু প্রকৃতির। নিজের দক্ষতা প্রদর্শনের চিন্তায় নার্ভাস। আত্মবিশ্বাসের বড়ো অবাব। কিন্তু প্রারম্ভিক জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারলে এরা কৃতিত্বের সঙ্গে নিজের দায়িত্ব সম্পন্ন করে। গরম কাতর। বুদ্ধিবৃত্তির তুলনায় দৈহিক সামর্থ্য কম। বয়স অনুপাতে চেহারায় বেশি বয়সের ছাপ। ঊর্ধ্বাঙ্গে শীর্ণতা। পাকাশয় ও কিডনির গোলযোগ, গ্যাসের জন্য পেট ফুলে ওঠে, ঢেকুর ওঠে। শরীরের ডানদিকে উপসর্গ বেশি। বিকেল ৪টা থেকে ৮টা পর্যন্ত সব কষ্টের বৃদ্ধি। শীতল পানীয় অসহ্য। গরম খাদ্য চায়। একা থাকতে ভয় পায়। নতুন কোনও দায়িত্ব নিতে ভয় পায়। এছাড়া প্যাসিফ্লোরা, ক্যালিফস, নাক্স-ভমিকা-সহ অনেক ওষুধ আছে, যা ব্যবহারে টেনশন থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

(লেখক একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হোমিওচিকিৎসক)

প্রাণের উৎসব, রঙের উৎসব দোল

নন্দলাল ভট্টাচার্য

রঙের 'ফাঁদ পাতা আছে ভুবনে'। দোল বা হোলি সম্পর্কে একথাটাই বলা যায় একটু ঘুরিয়ে। খ্রিস্টজন্মেরও বহু আগে শুরু হয়েছিল এই রঙের উৎসব। এমনটাই মনে করেন ঐতিহাসিকরা। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার, ভারতের মাটিতে ভারতীয় ধর্মের অঙ্গ হিসেবে যে উৎসবের উদ্ভব, সবরকম বেড়া ডিঙিয়ে তা আজ শুধু ভারতীয় উপমহাদেশ অথবা 'বৃহত্তর ভারতের' দেশগুলিতেই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষের কাছেও হয়ে উঠেছে প্রাণের উৎসব, ভালো লাগা এবং ভালোবাসার উৎসব। একাত্ম হওয়ার এবং মানব সংহতি সৃষ্টি এবং রক্ষার এক অতি কার্যকর মাধ্যম হয়ে উঠেছে দোল এবং হোলি।

দোল বা হোলি আদিতে ছিল একটি কৃষি উৎসব। এমনটাই সমাজতাত্ত্বিকদের অভিমত। ফাল্গুনে রবিশস্য ওঠার সময় কৃষিভিত্তিক ভারতের এটি ছিল একটি সামাজিক উৎসব। শীতের শেষে বসন্তের আগমনে প্রকৃতির বুকে লাগত যে রং তারই ছোঁয়ায় রঙিন হয়ে উঠত দেশের মানুষের মন। সেই রঙিন মন নিয়েই রঙের খেলায় মেতে উঠত সমাজ— মানুষ। সেখানে ধনী-নির্ধন, উচ্চ-নীচ, জাতপাত, বর্ণ কোনো কিছুই বাধা হয়ে উঠত না। সবকিছু ভুলে মানুষ সেসময় রং- সংগীত-নৃত্য-খাওয়াদাওয়ায় মেতে উঠত। নিজেরা মাতত, অন্যকে মাতাত। শীতের ঝরাপাতা, ফসলের অবশেষ, চারিদিকের সব আবর্জনা একজায়গায় জড়ো করে তাতে আগুন দিত। দাউদাউ করে জ্বলত আগুন আর শীতশেষের উত্তাপ গায়ে মেখে মানুষ মাতত প্রাণের উৎসবে। এটি ছিল অশুভের বিরুদ্ধে শুভবোধ জাগানোর উৎসব।

কৃষি সভ্যতার সেই প্রাচীন লোক উৎসবের রূপটি একসময় বদলে যায় ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সংযোজনে। রঙের ধর্মীয় অনুষঙ্গে তা ক্রমেই হয়ে ওঠে বাংলা বর্ষশেষের প্রায় অন্তিম একটি উৎসব। সে উৎসবের মধ্য দিয়েই মানুষ খুঁজে পায় আগামীদিনের পথ চলার রসদ। নতুন উৎসাহ এবং উদ্দীপনায় ভারতের মানুষ এখন একটি ধর্মীয় উৎসবের প্রবর্তন করে— যা ক্রমে হয়ে ওঠে এক বিশ্বজনীন উৎসব। সে কারণে শুধু ভারত নয়, বিশ্বেরও বিভিন্ন স্থানে এটি হয়ে উঠছে জীবনের উৎসব। শুধু ধর্মীয় আকার নয়, এটি এখন বহন করে চলেছে নতুন জীবনের বার্তা।

দোল বা হোলির উৎস সন্ধানে গিয়ে বহু ঐতিহাসিকের অভিমত খ্রিস্টজন্মের কয়েক শতক আগে থেকেই প্রচলন ছিল এই রঙের উৎসবের। তবে সেসময় বিশেষ করে ভারতের পূর্বাঞ্চলেই এর প্রচলন ছিল বেশি। তাঁদের আরও ধারণা যুগ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দোল বা হোলির গায়েও রূপান্তরের রং লেগেছে। বদলে গিয়েছে এই উৎসবের সম্পূর্ণ রূপটিই।

একটি অভিমত, আদিতে এটি ছিল বিবাহিতা মহিলাদের উৎসব। পরিবারের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য তাঁরা এই ধর্মীয় আচারটি পালন করতেন। তারই অঙ্গ হিসেবে রাকা বা পূর্ণিমার চাঁদকে পুজো করতেন তাঁরা।

নানা বৈচিত্র্যে ভরা এই ভারতের বিভিন্ন

অঞ্চলে এই রঙের উৎসব পালন করা হয় নানা নামে। হোলিকে কোথাও বলা হয় ফাগুয়া নামে। কোথাও এটি দোলযাত্রা, কোথাও বসন্ত উৎসব, আবার কোথাও এর পরিচিতি হোলিকা দহন বা কামদহন উৎসব হিসেবে।

প্রায় একই উৎসব কিন্তু নাম বিভিন্ন। আর এইসব বিভিন্ন নামের উৎসবের ধর্মীয় রূপের কেন্দ্রে রয়েছে বিভিন্ন দেবতা। যেমন হোলি বা হোলিকা দহনের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন বিষ্ণু। এখানে পুজো করা হয় নারায়ণ বা বিষ্ণুর। একইভাবে দোলযাত্রার রাধা-কৃষ্ণের অর্চনা হয়। আর কামদহনের দেবতা শিব।

বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনি থেকে জানা যায়, দানবরাজ হিরণ্যকশিপুর নিধন এবং তার পুত্র প্রহ্লাদকে রক্ষা করতে এবং অন্যায় বা দানব শক্তির বিনাশ শেষে ধর্ম-ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য বিষ্ণু আবির্ভূত হয়েছিলেন নরসিংহ রূপে। হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করেছিলেন তিনি নখরাঘাতে। তার আগে বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদকে হত্যার নানা চেষ্টায় ব্যর্থ হিরণ্যকশিপুর নির্দেশে শেষে তার বোন মায়াধরী হোলিকা প্রহ্লাদকে কোলে নিয়ে বসেন। এরপর চারদিকে আগুন দেওয়া হয়। কিন্তু বিষ্ণুর কৃপায় প্রহ্লাদ অক্ষত, অনাহুত থাকে। উলটে সেই আগুনেই পুড়ে মারা যায় হোলিকা। তারই থেকে হোলিকাদহন ও হোলি উৎসবের উদ্ভব।

দোলযাত্রায় রাধা-কৃষ্ণকে দোলা বা পালকি করে মন্দির থেকে আনা হয় দোলমঞ্চে। সেখানে যুগলমূর্তিকে দোলনায় বসিয়ে দোল দেওয়া হয়। পূজার্চনা শেষে পায়ে আবির দেওয়া হয়। তারপরই শুরু রঙের খেলা। এই দোলযাত্রা হয় ফাল্গুনি পূর্ণিমায় আর হোলি হয় তার পরদিন অর্থাৎ কৃষ্ণা প্রতিপদে।

পুরাণকথা, পুতনার বিষ স্তন্যদুগ্ধ পান করে কৃষ্ণের মুখের রং নীল হয়। গায়ের রংও। শ্যামবর্ণ কৃষ্ণের আশঙ্কা ছিল গৌরী রাধা তাঁকে গায়ের রঙের জন্যই পছন্দ করবে না। সেকথা জানায় মা-কেও। মা তাঁকে রাধার কাছে যেতে বলেন, মুখে রং মেখে। তাই করে কৃষ্ণ। রাধা সেই রং-মাখা কৃষ্ণকে গ্রহণ করেন এবং দুজনে মাতেন রঙের খেলায়।

অন্য কাহিনি, ফাল্গুনি পূর্ণিমা তিথিতে প্রত্যাক্ষিত হওয়ার ভয় নিয়েই কৃষ্ণ যান রাধার কাছে। রাধা তাঁকে প্রত্যাখ্যান তো করেনই না, বরং কৃষ্ণের মুখে গায়ে রং মাখিয়ে তাঁকে বরণ করেন। এরপর গোপকন্যা ও গোপবালকদের নিয়ে সকলে পিচকিরি দিয়ে পরস্পরের প্রতি রংজল ছুঁড়তে থাকে। তার থেকেই শুরু রঙ্গোলি বা রং দোল। এক সময় ধুলো কাদাও ছুঁড়তে থাকেন তারা পরস্পরের দিকে। এ কারণেই দোলের আরেক নাম ধুলোট বা ধূলোটি। মন্দির থেকে মঞ্চে রাধা-কৃষ্ণকে এনে পুজো করা হয় বলে এই পুজোর নাম দোলযাত্রা।

বঙ্গদেশ, অসম, ওড়িশায় প্রচলিত এই দোলযাত্রা উৎসব। অন্যদিকে উত্তর ভারত এবং অন্যত্র এর নাম হোলি। দোলকে কামদহন বলা হয় শিব রোষে মদন ভস্ম এবং পরে শিবেরই করুণায় প্রাণ ফিরে পাওয়ার ঘটনাকে স্মরণ করে। সতীর দেহত্যাগের আর সতীশোকে তাণ্ডব নৃত্যরত শিবকে শান্ত করতে বিষ্ণু তাঁর চক্র দিয়ে খণ্ডবিখণ্ডিত করেন সতীদেহ। শান্ত শিব বসেন যোগাসনে। বসেন ধ্যানে। ওদিকে দানব আক্রমণে বিপর্যস্ত দেবতারা একজন দক্ষ সেনাপতি পাওয়ার জন্য মিলন ঘটাতে চান শিব-পার্বতীর। সেই দেবকার্যের জন্য কামদেব বা মদন কামবাণ ছোঁড়েন শিবকে লক্ষ্য করে। ধ্যান ভাঙে শিবের। তাঁর দু' চোখে তখন আগুন। তাতেই পুড়ে ছাই কামদেব। আশুতোষকে তুষ্ট করে রতি অবশ্য ফিরে পান স্বামীকে। মদন ভস্মের পর সেই ছাই পরস্পরের দিকে ছুঁড়তে থাকেন সকলে। তা থেকেই দোলের এই দিনটি কামদহন দিবস হিসেবে চিহ্নিত হয়। কাম-দহনের স্মরণেই হোলির দিন ছাই মাখা ও মাখানোর চল শুরু হয়। তবে এই উৎসবটি মূলত দক্ষিণ ভারতের প্রচলিত।

বঙ্গদেশে দোলযাত্রা কেবল রাধা-কৃষ্ণের উৎসব নয়, এই দিনই জন্মগ্রহণ করেন মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সে কারণেও বিশেষ করে বৈষ্ণবদের কাছে দিনটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও স্মরণীয়।

রাখিবন্ধনের মতোই হোলির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি অধ্যায়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ সংঘটিত হয়। শেষ পর্যন্ত সে বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও তার রেশ থেকেই যায়। ওই বিপ্লবেরই কিছু নেতা কানপুর অঞ্চলে শুরু করেন সাতদিনের এক রঙের উৎসব। উৎসবের শেষ দিন বসে হোলি বা গঙ্গা মেলা। কানপুরে গঙ্গার ঘাটে ঘাটে হয় ওই মেলা। যোগ দেয় তাতে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই। কানপুর শহরে হিন্দু-মুসলমান সিপাহিরা যুক্তভাবে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যে লড়াই করে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে তারই নেতারা ছিলেন এই মেলার উদ্যোক্তা। সেদিনের সেই ধারা মেনেই আজও হয়ে চলেছে এই হোলি বা গঙ্গা মেলা। ওইদিন সব সরকারি অফিস, দোকান, বাজার সব বন্ধ থাকে। মানুষ সাতদিনের ওই উৎসবের সমাপ্তি দিনে যোগ দেয় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে।

দোল বা হোলি— এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ভারতের ইতিহাস। মুঘল সম্রাটরাও মাততেন এই রঙের উৎসবে। এই উপলক্ষ্যে বসত মহেফিল, গান-বাজনা, রং খেলায় মেতে উঠতেন সকলে। ঔরঙ্গজেব সিংহাসনে বসে এই উৎসব বন্ধ করে দেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এই রীতি আবার ফিরে আসে।

ব্রিটিশ আমলে ইংরেজরাও যোগ দিতেন এ উৎসবে। শিখ সম্রাট রণজিৎ সিংহের হোলি উৎসবে আসতেন বড়ো বড়ো ইংরেজ শাসক কর্তারাও। একটি তথ্য থেকে জানা যায়, রণজিৎ সিংহের এই উৎসবে ৩০০ মন রং ব্যবহার করা হতো।

হোলির প্রভাব যে কতটা ব্যাপক ছিল তা বোঝা যায় অক্সফোর্ড ডিকশনারির বিভিন্ন সংস্করণ দেখলে। বানান বিভিন্ন হলেও হোলি শব্দটি এই অভিধানে প্রথম অন্তর্ভুক্ত হয় ১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দে। অর্থাৎ এদেশে ইংরেজ রাজত্ব শুরুর প্রায় একশো বছর আগেই 'হোলি'র জায়গা হয় অক্সফোর্ড অভিধানে। এরপর ১৬৯৮, ১৭৮৯, ১৮০৯, ১৮২৫, ১৯১০ খ্রিস্টাব্দেও বিভিন্ন বানানে ওই অভিধানে হোলির অন্তর্ভুক্তি চলতেই থাকে।

একটি ধর্মীয় উৎসবের এভাবে জাতীয় উৎসবে পরিণত হওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল। তাই-বা কেন, আন্তর্জাতিক উৎসবে পরিণত হওয়ারও দ্বিতীয় কোনো নজির নেই। প্রকৃতির উৎসব, জীবনের উৎসব, সকলের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার উৎসব দোল বা হোলি তাই সর্বার্থেই এক অনন্য উৎসব।

(লেখক প্রাক্তন সাংবাদিক)

কারুশিল্পের পটভূমিকায় জয়পুরের দুটি নবরত্নের মন্দির

বিপ্লব বরাট

মল্লরাজা জয়মল্ল রাজস্থানের জয়পুর থেকে তাঁর আত্মীয়দের এনে দামোদর নদের তীরেই ঘন জঙ্গলে বসবাসের জন্য যে গ্রামটি গড়ে তুলেছিলেন, তা আজ জয়পুর নামে পরিচিত। জয়পুরে দত্ত পরিবারের রাধা দামোদর মন্দিরটি ল্যাটারাইট পাথরের বেশ বড়ো, দক্ষিণমুখী। নবরত্ন শৈলীর টেরাকোটার অলংকরণগুলির আকর্ষণ পর্যটকদের কাছে চিরকালীন। নয় চুড়া দামোদর মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ উৎসর্গ লিপির অভাবে মন্দিরটির নির্মাণ কাল সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তবে এর গঠন শৈলী থেকে অনুমান করা যায় যে খ্রিস্টীয় উনিশ শতকের প্রথমদিকে স্থানীয় দত্ত বংশের কোনো পূর্বপুরুষ মন্দিরটি তৈরি করিয়েছিলেন। দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে ত্রি খিলান, এই প্রবেশ পথের ও পার্শ্বে মন্দিরটির কারুকার্য সত্যই প্রশংসনীয়। মন্দিরের উচ্চতা প্রায় ৪০ ফুট। গর্ভগৃহে শ্রীশ্রী রাধা। 'গ্রাম ষোলো আনার' উদ্যোগে এখনও এই মন্দিরে দুর্গাপূজা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। তবে দুর্গা প্রতিমা নির্মাণ করা হয় না। গর্ভগৃহের দক্ষিণ দিকের কাঠের দরজাতে ফুলকারি নকশা ও দশবতার মূর্তি খোদাই করা। মন্দিরের দক্ষিণ দিকের ত্রি খিলানের সম্মুখ ভাগের মাঝের ফলকে নয়জন গোপিনীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যের চিত্র আছে।

শুধু রসবিন্যাসেই নয়, তত্ত্বগত ভাবে ও পদাবলীতে এবং পালাগানেও কথিত হয়েছে নব বিধি ভক্তির এই তত্ত্ব, যা যথার্থ ভাবে খোদাই করেছেন শিল্পীরা। মাঝে বাঁ দিকের রিলিফে 'রাই রাজা' ও ডান দিকে 'রাজারাম' চিত্র বর্ণিত হয়েছে। ডান দিকের খিলানে রাম-রাবণের যুদ্ধের দৃশ্য। পোড়ামাটির ভাস্কর্যে রামায়ণ আলেখ্য মল্লরাজাদের সভাকবি কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীর বিষ্ণুপুরী রামায়ণ কথা মনে করিয়ে দেয়। বাদিকের খিলানে কর্ণ ও অর্জুনের যুদ্ধ দৃশ্য। পূর্ব দিকের বাম দিকের খিলানে শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমনের দৃশ্য। মাঝের পোড়ামাটির ফলকে সংকীর্তন কালে শ্রীচৈতন্যদেব ভাব সমাধি প্রাপ্তির দৃশ্য। সারি খোলবাদক ও উন্মুক্ত নৃত্য শিল্পীর দৃশ্য। এই সব মূর্তির ছন্দময় উচ্ছ্বাসেই যেন প্রথম যুগের পোড়ামাটির শিল্পের মূল সুরটি বেজে ওঠে। ডান দিকের পোড়ামাটির জীবন্ত উজ্জ্বল চিত্রটি ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ ও পাশেই অনন্তশয়ান বিষ্ণু। মল্লরাজা প্রথম রঘুনাথ সিংহের রাজত্বকালে ১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত গোকুল নগরের গোকুল চাঁদ মন্দিরে ভাস্কর্য শিল্পের এক অনুরূপ অনন্তশায়িত বিষ্ণু মূর্তি ছিল। বর্তমানে বিষ্ণুপুরের আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে অনন্তশায়িত মূর্তিটি বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর দেউল গাত্রে ও বিষ্ণুপুরের শ্যামরায় পঞ্চরত্ন মন্দিরের ফলকে উৎকীর্ণ আছে। কার্নিসের ফলকে বকাসুর বধ, নৌকা যাত্রার দৃশ্য। মন্দিরের গাত্রে ভীষ্মের শরশয্যা ও পৌরাণিক কাহিনি সংবলিত মূর্তি ভাস্কর্যগুলি বেশ সজীব যা একান্ত আকর্ষণীয়।

ক্ষেত্র সমীক্ষায় দেখা যায়, রাধা দামোদর জীউ মন্দিরের অনতিদূরে দক্ষিণে বুড়ো শিব মেলা। পাশেই বিশাল প্রাচীর বেষ্টিত অঙ্গন মাঝে দে পরিবারের অনুরূপ এক ল্যাটারাইট পাথরে নির্মিত শ্রীধরলাল জীউ নবরত্ন মন্দিরটি বিরাজমান। প্রতিষ্ঠালিপি অনুসারে দক্ষিণমুখী শ্রীধরলাল জীউ মন্দিরটি ১২৫০ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত। মন্দিরটি উঁচু ভিত্তি বেদির উপর স্থাপিত, পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে ত্রি খিলান প্রবেশ পথ বিশিষ্ট অলিন্দ আছে। মন্দিরটির দক্ষিণ ও পূর্বদেওয়ালে শোভা পায় অতি মনোরম ভাস্কর্য বা রিলিফ।

দত্ত পরিবারের রাধা দামোদর নবরত্ন মন্দির।

কারুকার্যের সমধিক অংশ জুড়ে আছে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ধর্মমত নির্বিশেষে নানান পৌরাণিক কাহিনি। রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গলকাব্য আশ্রিত বহু উপাখ্যান এবং অজস্র ফুলকারি ও জ্যামিতিক নকশাও সেকালের সমাজ জীবনে ঘটিত অসংখ্য চিত্রকল্প দেখা যায়। সেগুলির মধ্যে শিল্প শাস্ত্রানুযায়ী মার্গ রীতির ছাপ থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেসব আছে লোকায়ত শিল্পকৃতি। পূর্ব দিকের ডান দিকের রিলিফে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের একটি দৃশ্য। সমুদ্রের মাঝে শ্রীমন্ত সদাগরের পদ্মের উপর আসীনা দেবী চণ্ডীর দর্শন। কুলুঙ্গির মধ্যে একটি ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ মূর্তি দৃষ্টিগোচর হয়। একই অঙ্গে রাম, কৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ— ছয় হাত বিশিষ্ট বিগ্রহ। ষড়ভুজ গৌরাঙ্গের সুন্দর চিত্রটি বাঁকুড়ার যে মন্দিরে দেখা যায়, তার মধ্যে হদলনারায়ণপুরের মেজ তরফের নবরত্ন রাধাদামোদর মন্দির, বিষ্ণুপুরে শ্যামরায়ের পঞ্চরত্ন মন্দির ও কেষ্ট রায়ের জোড়বাংলা মন্দিরে। দক্ষিণ দিকের ডান দিকের খিলানে জমিদারের অন্যত্র গমন ও বাজনদার দল-সহ দৃশ্য দেখা যায়। রাঢ় বাঁকুড়ার ললিতকলা সংগীতের মূর্চ্ছনায় হৃদয়ে অন্তরে এক অপূর্ব অনুভূতি জাগায়।

(আঞ্চলিক ইতিহাস লেখক ও ক্ষেত্রসমীক্ষক)

মন্দিরগাত্রের চিত্র

এবারের নির্বাচন কতটা অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে

সুকল্প চৌধুরী

রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের ঢাক-ঢোল-ঘণ্টা-বাঁশি-কাঁসর সবই বেজে গিয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই রাজনৈতিক দলগুলির তৎপরতা তুঙ্গে। রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস যে কোনও প্রকারে ক্ষমতা ধরে রাখতে— প্রশাসন, পুলিশের একটা অংশ, এক শ্রেণীর আশা কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, সিভিক, গ্রিন পুলিশ, শিক্ষক-সহ গুন্ডা, সমাজবিরোধী, পাচারকারী, তোলাবাজদের নিয়ে প্রস্তুত। বিরোধী দলগুলিও নিজেদের সাংগঠনিক শক্তি নিয়ে ময়দানে নেমেছে।

আতান্তরে কিন্তু সাধারণ মানুষ। যারা চাইছেন নিজেদের অধিকার প্রয়োগ করে মনোমতো প্রার্থীকে ভোট দিয়ে বিধানসভায় নির্বাচিত করতে। ১৯৭২ সালের নির্বাচনী মহা সন্ত্রাস দেখেছেন রাজ্যবাসী। এরপর ছিল জরুরি অবস্থার কালোদিনগুলি। কিন্তু ১৯৭৭ সালে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসনে অবাধ ভোটদানের সুযোগ পেয়ে কংগ্রেসকে সম্পূর্ণ মুছে দিয়ে বামেদের ক্ষমতায় এনেছিলেন ভোটদাতারা। তারপর থেকে রাজ্যের সিপিএম পরিচালিত বাম শাসক দলের সঙ্গে সেই সময়কার কংগ্রেস এবং অনেক সময়ই হরেক দলের মিলিজুলি সরকারের বিভিন্ন সমীকরণ ও বামেদের 'সায়েন্টিফিক রিগিং'-এর দৌলতে রাজ্যে অবাধ, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ ভোট হয়নি। বাম শাসনে অতিষ্ট মানুষ ২০১১ সালে সঠিক বিকল্প না পেয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে ক্ষমতায় নিয়ে আসে। গালভরা হরেক প্রতিশ্রুতি দিলেও মানুষের ন্যূনতম আশা পূরণ করতে পারেনি মমতার সরকার। এবারের নির্বাচনের আগে ফের আক্ষরিক অর্থে সর্বহারা সিপিএমের নেতৃত্বে বামেরা, কংগ্রেস আব্বাস সিদ্দিকির দল জোট করেছে। তবে রাজ্যের মানুষ এই জোটকে কতটা মেনে নেবে তাই নিয়ে হাজারো প্রশ্ন আছে।

পশ্চিমবঙ্গে গত দশ বছরে কয়েকটি পরিবারের হঠাৎ প্রচুর অর্থবান হয়ে ওঠা ছাড়া আর কিছু হয়নি। একটিও শিল্প কারখানা তৈরি হয়নি। বেড়েছে পাচার, তোলাবাজি, জমির মাফিয়া, সিন্ডিকেটরাজ-সহ অপরাধের অনেক রকমফের। এই রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বহু আলোচনা হয়েছে। শিক্ষায়, শিল্পে, রোজগারে, মাথাপিছু আয়ে দেশের ভেতর একদম নীচের সারিতে এই রাজ্য। অথচ তৃণমূল নেত্রীর দাবি তিনি নিরানব্বই ভাগ কাজ শেষ করে ফেলেছেন। এমনকী গত লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে বিজেপির সাফল্য দেখে বলেই ফেলেছিলেন তিনি নাকি প্রত্যাশার থেকে বেশি কাজ করেছেন, তাই ভোটদাতারা বুঝতে পারেননি।

বাস্তব হলো, স্কুলে নিয়োগ বন্ধ, সরকারি ও আধা সরকারি চাকরিতে মাসিক মাত্র ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকায় দলীয় সমর্থকদের নিয়োগ চলছে, যা কিনা আউটসোর্সিং-এর নামান্তর মাত্র। হাজার হাজার প্রার্থী চাকুরির পরীক্ষা দিয়ে বসে আছেন বছরের পর বছর। এ এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতি। তবে স্কুল বা অন্যত্র নিয়োগ একেবারেই বন্ধ এমনটা নয়। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-নেত্রীদের আত্মীয় স্বজনদের এবং এর বাইরে থাকা ব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রচুর টাকার বিনিময়ে নিয়োগপত্র দেওয়া হচ্ছে। দেখা গিয়েছে পিএসসির মাধ্যমে নিয়োগেও রাজ্যের শাসকদল হস্তক্ষেপ করছে। এই অনিয়ম নিয়ে রোজ আদালতের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে বঞ্চিতদের।

এর পাশাপাশি রয়েছে প্রশাসনে ব্যক্তি নির্ভরতা। 'আমিই সব' এমনটাই প্রতিষ্ঠা হয়েছে প্রশাসনের সর্বত্র। 'একটাই পোস্ট বাকি সব ল্যাম্প পোস্ট' এমন ইমেজ সুচারুভাবে তৈরি করা হয়েছে। জেলাগুলিতে প্রশাসনিক বৈঠকের নামে জমিদারি স্টাইলে

স্তাবকদের নিয়ে দরবার বসিয়ে সরকারি টাকায় মোচ্ছব চলে। কোনও নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে অপছন্দ হলেই প্রশাসনিক কর্তাদের বদলি করা হচ্ছে অথবা ওএসডি করে রাখা হচ্ছে। প্রশাসনে নিরপেক্ষতা দেখানো অলিখিত ভাবে নিষেধ। দুয়ারে সরকার কর্মসূচি নিরপেক্ষ ভাবে পালন করতে গিয়ে মাত্র দু'মাসের মধ্যে বদলি হয়েছেন মাথাভাঙার মহকুমা শাসক। তাই নিজের চেয়ার রক্ষা করতে আর নিজের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত রাখতে 'একটাই পোস্টের' দিকে তাকিয়ে প্রায় সবাই। পশ্চিমবঙ্গের যারা তথাকথিত বুদ্ধিজীবী বলে নিজেদের জাহির করেন তাঁরাও আজ বয়সের ভারে নখদন্তহীন তাঁবেদারে পরিণত হয়েছেন। নীচু থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবই দেখলে মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের পড়ুয়ারা পাকিস্তানের বাসিন্দা।

এমনই পরিস্থিতিতে ভোট হতে চলেছে রাজ্যে। মানুষের মনে প্রশ্ন, ভোটদান শান্তিপূর্ণ ও অবাধ হবে কিনা। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অনেকটাই নির্ভর করে নির্বাচন কমিশনের উপর। সকলেই জানেন, সংবিধান অনুসারে লোকসভা ও বিধানসভার ভোট প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। বিধানসভার ভোট ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যস্তরের সমস্ত সরকারি কর্মী ও পুলিশ বাহিনী নির্বাচন কমিশনের আওতায় চলে আসে। এই সময় থেকে শুরু করে নতুন মন্ত্রীসভার শপথ গ্রহণ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রণে থাকেন সমস্ত সরকারি কর্মচারী ও পুলিশ। যে কোনও সরকারি কর্মী বা পুলিশ কর্মীকে বদলি, সাসপেন্ড করতে পারে নির্বাচন কমিশন বা আইন অনুসারে অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এই নিয়ে আদালতে বা স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবুনালে (স্যাটে) সাধারণত কোনও প্রশ্ন চলে না।

এর পরেও কেন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। তার অনেকগুলি কারণের ভেতর অন্যতম হলো নির্বাচন কমিশনের আওতায় পুলিশ বা সরকারি কর্মচারীরা চলে এলেও তাঁদের বড়ো অংশের ভেতর শাসকদলের প্রতি আনুগত্য থেকেই যায়। বর্তমানে রাজ্য পুলিশের শীর্ষ মহল থেকে গ্রিন-সিভিক ভলেন্টিয়ার পর্যন্ত শাসক দলের 'ক্রীতদাসে' পরিণত। ফলে প্রকাশ্যেই ভোট সাবোটেজ করতে দেখা যায়। বামেদের সময় 'বিপ্লব করে দেশ উদ্ধার করা' কো-অর্ডিনেশন কমিটি প্রকাশ্যে ভোট লুঠ করত এবং অবাধ ভোটদানে বাধা দিত। বর্তমানে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা, পুলিশ ও প্রশাসনের একটি বড়ো অংশের প্রকাশ্য মদতে 'ভোটের কাজ নিয়ন্ত্রণ' করে। ভোটের অনেক আগে থেকেই শাসক দলের কর্মীদের অস্ত্র হাতে দাপিয়ে বেড়ানো, বিরোধী মনে হলেই 'সহবৎ শেখানো', চাকরি ও অন্যান্য প্রলোভন দেখানো, বিভিন্ন মহল্লায় মদ বিতরণ, টাকা ছড়ানো এসব তো আছেই। এর বাইরে 'চড়াম চড়াম ঢাক বাজানো, 'নকুল দানা খাওয়ানো', 'গুড় বাতাসা বিতরণ' 'রাস্তায় উন্নয়ন দাঁড়িয়ে থাকা' দেখেছেন মানুষ।

দেশের বর্তমান মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল আরোরা আগেই ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের বিধানসভা ভোট হবে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ। তিনি রাজ্যে আট দফায় ভোট ঘোষণা করেছেন। এই ধরনের ঘোষণা সমস্ত লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনের আগেই করা হয়। কিন্তু দেখা গিয়েছে, ভোটের দিন শাসক দলের বিরুদ্ধে হাজারো অনিয়মের সপ্রমাণ অভিযোগ কার্যত নীরবে কাঁদে। তবে জাঁদরেল প্রশাসক সুনীল আরোরার কার্যকলাপ এবং বিভিন্ন নির্দেশ এবারে সাধারণ মানুষের মনে আশা জাগিয়েছে। তিনি পুলিশ ও সাধারণ প্রশাসনের সর্বস্তরের আধিকারিক ও কর্মীদের বিরুদ্ধে নিরপেক্ষতার অভাবের সামান্য প্রমাণ পেলেই শোকজ ছাড়াই কড়া ব্যবস্থা নেবার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। যা শাসক দলের 'লেজুড়' এমন সরকারি কর্মীদের ভবিষ্যতে ইনক্রিমেন্ট, পদোন্নতি এসবে প্রভাব পড়তে পারে। ভোটের আগে

ফঃ ৪

অনেক দিন একই জেলায় থাকা সরকারি আধিকারিক, কর্মী, পুলিশকে বদলি করা হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই বিভিন্ন পুলিশ জেলা গঠন করেছেন। সেই যুক্তি দেখিয়ে নিজের দলদাসে পুলিশদের পাশের পুলিশ জেলায় কিন্তু একই প্রশাসনিক জেলায় রেখে দিয়েছেন। নির্বাচন কমিশন এই জেলা পুলিশের তত্ত্ব মানতে চাইছে না। তারা প্রশাসনিক জেলাকেই গুরুত্ব দিচ্ছেন। ইতিমধ্যেই ১৭২৩ জন বিভিন্ন স্তরের পুলিশ ও সাধারণ প্রসাসনের আধিকারিক-কর্মীকে রাজ্য প্রশাসন বদলি করেছে। এবারে নির্বাচন কমিশন খতিয়ে দেখছে বদলি হয়ে যাওয়া কর্মীদের অতীত। নির্বাচনের দিন ঘোষণার পরে তাঁরা ফের বদলি হতে পারেন।

কিছুদিন আগে সুনীল আরোরার নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ কলকাতায় এসেছিল। তিনদিনের এই সফরে রাজ্য প্রসাসন ও পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক করেন নির্বাচন কমিশনের সদস্যরা। সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজ্যের বর্তমান আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি কলকাতার আইনের অনুশাসন নিয়েও যথেষ্ট উষ্মা জানিয়েছেন। জানা গিয়েছে রাজ্য প্রশাসকদের সঙ্গে নিভৃত বৈঠকে মুখ্য সচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বরাষ্ট্র সচিব হরেকৃষ্ণ দ্বিবেদী এবং রাজ্য পুলিশের ডিজি বীরেন্দ্রর কাছে বুথ ওয়ারি আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটার তালিকা তুলে ধরেন সুনীল অরোরা। এই তালিকার সঙ্গে রাজ্য প্রশাসনের দেওয়া তালিকার কোনও মিল নেই। রাজ্যের শীর্ষ আমলারা বুঝে গিয়েছেন এবারে নির্বাচন কমিশনের চোখ কতটা খোলা। রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রসঙ্গ উঠে এসেছিল। পঞ্চায়েত নির্বাচনে পেশিশক্তি ও পুলিশ-প্রশাসনের সাহায্যে বিরোধীদের প্রার্থী দিতে না দেওয়া, ব্যাপক বোমাবাজি, খুন, ভয় দেখানো নিয়ে হাজারো অভিযোগ জমা পড়লেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। যেখানে কোনও ভাবে বিরোধীরা প্রার্থী দিয়ে জয়লাভ করেছেন সেখানেও ভয় দেখিয়ে তাদের শাসক দলে টেনে আনার ঘটনা ঘটেছে। এই দল বদলকারীরা সবাই 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নে নাকি শামিল হতে' চেয়েছিলেন। একই ছবি দেখা গিয়েছিল কয়েকটি পুরসভা নির্বাচনেও। অভিযোগ উঠেছিল পুজালি পুরসভার বিজেপির দুই নির্বাচিত মহিলা কাউন্সিলরের ছেলে ও স্বামীকে অপহরণ করিয়েছিলেন এই পুরসভার পৌরপ্রধান ও তৃণমূলের নেতা ফজরুল রহমান। পরে এই দুজনেই শাসক দলে যোগ দিতে বাধ্য হন। জানা গিয়েছে, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজ্যের মুখ্য সচিবের কাছে এই প্রসঙ্গটিও তুলেছিলেন। বৈঠকে রাজ্যের নিরাপত্তা উপদেষ্টা সুরজিৎ কর পুরকায়স্থের প্রশাসনের সর্বস্তরে কী ভূমিকা এবং তাঁর প্রভাব কতটা সেই বিষয়টিও ওঠে। এবারের কমিশনের সফর, রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে কয়েকটি বৈঠক অনেকটাই খোলামেলা ছিল। অনেকেই মনে করছেন, সাংবাদিকদের মাধ্যমে যাতে সাধারণ মানুষ নির্বাচন কমিশনের মনোভাব বুঝতে পারেন সেই কারণেই এতটা খোলামেলা।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল অরোরা সাংবাদিকদের জানান, বিধানসভা ভোটে পেশিশক্তি, বেআইনি অর্থের ব্যবহার, প্রশাসনের নিরপেক্ষতার অভাবকে কড়া হাতে মোকাবিলা করা হবে। আইনের শাসন থাকবে। সিভিক ভলেন্টিয়ার, গ্রিন পুলিশকে ভোটের কাজে কোনও ভাবেই ব্যবহার করা যাবে না। বিগত লোকসভা, পঞ্চায়েত বা পুরসভা নির্বাচনে সিভিক ও গ্রিন পুলিশের 'উল্লেখযোগ্য ভূমিকা' ছিল। ভোটের কাজ নিয়ন্ত্রণ করবে আধাসেনা। এবারের নির্বাচনে এক হাজার কোম্পানি আধা সেনা আসবে। মূলত উত্তর-পূর্ব রাজ্য থেকেই আনা হবে এই বাহিনী। বর্তমানে এই রাজ্যের হাতে ২৩ কোম্পানি আধা সেনা আছে। প্রয়োজনে রাজ্য তাদের এখনই কাজে লাগাতে পারে। এবারে বাইক র‍্যালি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

রাজ্যের শাসক দল, প্রশাসন, দলদাস পুলিশের অংশ, 'অনুপ্রাণিত' সরকারি কর্মীরা বুঝে গিয়েছে নির্বাচন কমিশন রাজ্যের প্রেরিত রিপোর্টের উপর নির্ভর করে নেই। সমান্তরাল বিস্তারিত নজরদারি আছে নির্বাচন কমিশনের। এখানেই ভয় তৃণমূল কংগ্রেসের। এখানেই ভরসা সাধারণ মানুষের। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা আরও বেশি অবজারভার, পর্যবেক্ষক এবারে আসবেন। ২০১৬ সালে ৭ দফায় ভোট হয়েছিল। এবারে মোট ১ লক্ষ ১ হাজার ৭৯০টি বুথে ৮ দফায় ভোট গ্রহণ করা হবে। দ্বোতলায় বা তিন তলায় বুথ হবে না। ৮০ বছরের ওপরে যারা তাঁরা পোস্টাল ব্যালটের সুবিধা পাবেন।

সর্বোপরি, সঠিক ভাবে ভোট সম্পন্ন করতে সাধারণ মানুষের সহযোগিতা চেয়েছে নির্বাচন কমিশন। মানুষ একজোট হলে বুথের রাস্তায় দাঁড়ানো 'তৃণমূলীদের উন্নয়ন' এক লহমায় গর্তে লুকোবে।

(লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

নন্দীগ্রামে মাননীয়ার পায়ে আঘাতের চিত্রনাট্য একেবারেই ফ্লপ

বিশ্বপ্রিয় দাস

সব বেশ চলছিল, একেবারেই চিত্রনাট্য মেনে। মন্দির-মসজিদে যাওয়া থেকে শুরু করে চায়ের দোকানে চা তৈরি। এটা পর্যন্ত ঠিকঠাক ছিল। কিন্তু মাননীয়া আপনার যে পদস্খলন হবে, সেটা হয়তো চিত্রনাট্যের বাইরে ছিল। যদিও আক্রান্ত হবার একটি ঘটনা যে ঘটতে পারে, সেটা আপনি বেশ কয়েক মাস ধরেই বলে আসছেন। সাধারণ মানুষ ভাবছিলেন, আপনি রাজ্যের সুপ্রিমো, আপনাকে কে আঘাত করার সাহস পাবে? আপনি যে ধরনের সুরক্ষা বলয়ের মধ্যে চলাফেরা করেন, সেটা টপকে কে আপনার কাছে যাবে?

আপনার দলের মুখপাত্র, পেশায় তিনি একসময়ে সাংবাদিকতা করেছেন আর আপনার পাশে আঁচল ধরে ঘুরেছেন। তিনি আবার আপনার এই ঘটনার সঙ্গে একটি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে রাজীব গান্ধীর হত্যার তুলনা টানলেন। ভাগ্য ভালো, সেরকম কিছু ঘটেনি। আপনার কাছে তো জঙ্গলমহলের সেইসব মানুষেরা একেবারে বশ মেনেছে। তাহলে আর আপনার ওপর আঘাত কে করবে? আপনার ওপর আঘাত হেনে এই মুহূর্তে আপনাকে সহানুভূতি পেয়ে জনপ্রিয়তা বাড়াতে কোনো রাজনৈতিক দল দেবে না। অতি পাগলেও এটা জানে।

নন্দীগ্রামে আপনাকে নাকি চার-পাঁচজন ধাক্কা মেরেছে? মাননীয়া, তাঁদের নিশ্চয়ই দেখা গেছে। এটা একটা বাচ্চাও বলবে, তাঁদের ধরাটা খুব সহজ ছিল, আর ধরা পড়লে তাঁদের যে কী অবস্থা হয়তো সেটা সহজেই অনুমেয়।

তবুও, দুর্ঘটনায় আপনি পায়ে আঘাত পেয়েছেন। আপনি সারা রাজ্যে সুপার স্পেশালিটি চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাহলে মাননীয়া, গ্রিন করিডোর করে আপনাকে ছুটে কেন সেই কলকাতার এসএসকেএমে আসতে হলো? এটা হয়তো ঠিক যে কাছাকাছি সরকারি যে কোনো একটি চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসা করাতেই পারতেন, কেননা এটা পুলিশে অভিযোগ জানাতে গেলে দরকার হয়ে পড়ে। আর এই রকম পরিস্থিতি, যেখানে আপনি ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেয়েছেন, সেখানে এটাকে হাতিয়ার করে, বিরোধীদের কোণঠাসা করে, সহানুভূতি আদায়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে যাবেন আপনি। কিন্তু যখন এসএসকেএমে নানা পরীক্ষায় কোনো অস্বাভাবিকতা ধরা পড়ল না, আপনি তখন, আপনার পকেটের চিকিৎসকদের একটা বোর্ড গঠন করতে বাধ্য করলেন। আসরে নেমে পড়লেন ডাঃ শান্তনু সেনের মতো আপনার কাছের লোক। তিনি এসেই নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে ঘোষণা করলেন যে, আপনার পায়ে সফট টিস্যু ইনজুরি হয়েছে ও পায়ের হাড়ে চিড় ধরেছে। যাই হোক অন্তত দু-তিনটি দিন যদি হাসপাতালে থাকা যায়, সেই সুযোগটা আপনি নিলেন। আর আপনার চেলারা রাজ্য জুড়ে সেই ষড়যন্ত্রের গন্ধে মাখামাখি হয়ে বিরোধীদের একেবারে চুপ করিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছে। আপনি তো এরকমটাই চাইছিলেন। কিন্তু সত্যি বলতে কী, গেমপ্ল্যানটা বড়ো কাঁচা হয়ে যাওয়াতে সেভাবে ঝটকা দিতে পারল না মানুষের মনে। পরেরদিন সকাল থেকেই সামাজিক মাধ্যম আপনার লোকেরা, আপনার শোয়া, পায়ে প্লাস্টার করা ছবিতে ভরিয়ে দিয়েছে। সাধারণ মানুষ বাসে, ট্রামে, চায়ের দোকানে আপনাকে 'নাটুকে দিদি' তকমা লাগিয়ে, সেই ছবি দেখিয়ে হাসাহাসি করছে।

মাননীয়া, আপনি নন্দীগ্রামে একটিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছিলেন। যে করেই হোক, নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারীকে প্রচারে আটকানো। যদি আপনার ভাইয়েরা আপনার নাটকটাকে খেয়ে নেয়, তাহলে সেই চেষ্টা সফল রূপ নেবে। দুই, নন্দীগ্রামের মানুষ একটা অপরাধবোধে ভুগে আপনার প্রতি সহানুভূতিশীল হবে। সেটা আর হলো না।

(লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক)

গড়বেতায় স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের রাজ্য সম্মেলন

গত ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারি স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতার আমলাঘোরার শ্রীশ্যামসঙ্গ ধর্মশালায়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এশিয়াডে রৌপ্যপদক ও সাফে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত প্রখ্যাত সাঁতারু ও সমাজসেবী সুরজিত ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের অখিল ভারতীয় সংগঠন সম্পাদক কাশ্মীরিলাল, সহ সম্পাদক সতীশ কুমার, অখিল ভারতীয় সহ সংযোজক ড. ধনপতরাম আদরওয়াল, সংঘর্ষ বাহিনী প্রমুখ বন্দে শঙ্করজী। ১৪ টি জেলা থেকে শতাধিক কার্যকর্তা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয়— (১) অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে। (২) অনুপ্রবেশকারীদের দেশের শত্রু হিসেবে ঘোষণা করা হোক। (৩) দেশের প্রত্যেক নাগরিকের নাগরিকত্ব সুনিশ্চিত করার পর এনআরসি এবং সিএএ চালু করা হোক। দুর্নীতিগ্রস্ত আমলাদের হাতে দেশবাসী যেন অহেতুক নাকাল না হয়। সম্মেলনে সর্বপ্রকার সবযোগিতা করেন সতীশ সিংহ ও প্রদীপ লোধা।

ক্রীড়া ভারতীর উদ্যোগে হাওড়া জেলার ধুলাগড়ীতে আত্মরক্ষা প্রশিক্ষণ শিবির

ক্রীড়াপ্রেমীদের সর্বভারতীয় সংগঠন ক্রীড়া ভারতী, হাওড়া জেলার উদ্যোগে গত ২১ ফেব্রুয়ারি সাঁকরাইল থানার ধুলাগড়ীতে সারাদিন ব্যাপী আত্মরক্ষা প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে এলাকার ১২৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া ভারতীর দক্ষিণবঙ্গের সহ সম্পাদক তথা প্রাক্তন সেনা আধিকারিক ড. পার্থ বিশ্বাস, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কৌশিক প্রামাণিক, প্রাক্তন সেনা আধিকারিক ক্যাপ্টেন অশোক পায়রা। শিবির পরিচালনা করেন সংস্থার হাওড়া জেলা সম্পাদক শুভেন্দু সরকার।

হিন্দু জাগরণ মঞ্চের রক্তদান শিবির

উত্তরবঙ্গ প্রান্ত বীরাঙ্গনা প্রমুখ পাঞ্চালী দেব শিকদারের মা স্বর্গীয়া চন্দনা দেব শিকদারের প্রয়াণদিবস উপলক্ষ্যে গত ৫ মার্চ দেব শিকদার পরিবারের উদ্যোগে এবং হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, জলপাইগুড়ি নগর সমিতির সহযোগিতায় স্থানীয় সুভাষ ভবনে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে শিবিরের শুভারম্ভ করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের জেলা সঙ্ঘচালক নারায়ণ সাহা। উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সামাজিক সমরসতা প্রমুখ দিলীপ ভগৎ। শিবিরে ৫৫ জন রক্ত দান করেন।

রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জেলা সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু গুহ, হিন্দু জাগরণ মঞ্চের জেলা সভাপতি গোবিন্দ ঘোষ, জেলা সম্পাদক মনোজ দত্ত, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত বীরাঙ্গনা প্রমুখ পাঞ্চালী দেব শিকদার, যুবা প্রমুখ অমর ভট্টাচার্য, নগর সভাপতি তাপস ভৌমিক প্রমুখ।

কিপার

পার্থসারথি গুহ

অনুভার সকাল থেকে ভারী মন খারাপ। কিছুতেই কোনও কাজে মন বসছে না। মেয়ের চিন্তা কুরে কুরে খাচ্ছে। স্বাভাবিক রুটিনটাই ভেস্তে গিয়েছে।

অন্যদিন সেই সকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ঘুম থেকে উঠে একার হাতে ঘরগৃহস্থালীর কাজ সারে। তারপর অফিস যাওয়ার ব্যস্ততা শুরু হয়। কিন্তু আজ আর কিছুতেই শরীর চলছে না।

ওদিকে রৌণক পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। সকালের চা দেওয়ার সময় অনুভা ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল, মেয়েটা কি আমার একার? কোনও দায়িত্ব নেবে না তুমি?'

কোনওমতে উঠে বসে ঘুম জড়ানো আবেশে রৌণক বলেছে, 'তুমিই বা ছোট্ট একটা বিষয় নিয়ে হ্যাঁচোড়প্যাঁচোড় করছ কেন। মেয়ে বড়ো হচ্ছে। অমন একটু হয়।'

'অমন একটু হয়। এটা তোমার চোখে অমন একটু?' অনুভা এমন বিশ্রীভাবে চিৎকার করে উঠেছিল যে আরেকটু হলে হাত থেকে চায়ের কাপটা পড়েই যাচ্ছিল রৌণকের। স্বাভাবিক রিফ্লেক্সে সেটা সামলে নিল পরক্ষণে।

অনুভা ভাবছিল ওর বরটা গোলকিপারই থেকে গেল। বাবার দায়িত্ব আর নিল না। ঝজার সেই নার্সারি বয়স থেকেই অনুভা খালি খেটে খেটে মরল। নিজের মেয়ে। খেটে মরল আবার কী কথা?

তাও অনুভা সেই আফশোসেই মরে। সত্যি তো আর পাঁচটা বাবাও তো আছে। এই তো ঋজার বন্ধুদের বাবারা কি ব্যস্ত থাকে না? তাও ছেলে-মেয়েদের সময়মতো স্কুলে ছেড়ে দেওয়া, প্রয়োজনে স্কুল মিটিঙে শামিল হওয়া সবেতেই তাদের দেখা যায়।

দেখা যায় না একজনকেই। একদা কলকাতা ময়দান কাঁপানো গোলকিপার রৌণক মুখোপাধ্যায়কে।

মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল থেকে অনেক অফার এসেছে। কিন্তু চাকরির বাধ্যবাধকতায় রৌণকের আর বড়ো ক্লাবে খেলা হয়নি। থেকে গিয়েছিল অফিস ক্লাব মানে রেলওয়ে এফসিতে।

অনুভার সঙ্গে রৌণকের আলাপও এক প্রকার খেলার সূত্র ধরেই। আসলে অনুভার বাবা-কাকারা ছিলেন ফুটবল পাগল। পারিবারিক স্যানিটেশন ব্যবসার বাইরে মাঠই ছিল তাঁদের ধ্যানজ্ঞান।

ছোটো থেকেই বাবা-কাকাদের কাঁধে চেপে খেলার মাঠে যেত। কাকা আবার মোহনবাগানের মেম্বার ছিল। ফলে ক্লাব চত্বরও অবারিত দ্বার হয়ে উঠেছিল। মোহনবাগানের খেলা থাকলে তো কথাই ছিল না।

একটু বড়ো হওয়ার পর পারিবারিক একটা অনুষ্ঠানে আলাপ রৌণকের সঙ্গে। সবে ইলেভেনে পড়ছে তখন অনুভা। আর রৌণক তখন সবে ফার্স্ট ডিভিশন ক্লাব সালকিয়া ফ্রেন্ডসে খেলছে।

অনুভা চট্টোপাধ্যায়ের মামাতো ভাই অঙ্কুশ ওরফে টুটুনের পৈতে বলে কথা। হই হই পড়ে গিয়েছিল ওদের মধ্যে। কোন্নগরের বাড়ি থেকে অনুভারা পোস্টিং হয়ে গিয়েছিল বেহালা জেমস লং সরণির মামাবাড়িতে।

মামাতো ভাই-বোনেদের মধ্যে তখন সে কী মজা বলে বোঝানো যাবে না। বড়োদের হাজারো শাসনের বেড়াজাল এড়িয়ে ছাড়া গোরু যেন একেকটা।

সেই পৈতে বাড়িতেই দেখা রৌণকের সঙ্গে। লম্বা, ঢ্যাঙা, শ্যামবর্ণ, মুখচোরা ছেলেটাকে প্রথম দেখেই কেমন একটা ওয়ান টু কা ফোর হয়ে গিয়েছিল অনুভার।

তখন তো আর এখনকার মতো পরিস্থিতি ছিল না। তাও অবুঝ মন কিছুতেই বাধ মানছিল না। মনে হচ্ছিল যেভাবেই হোক ছেলেটার সঙ্গে আলাপ করতেই হবে।

ওদের যে কোনও ব্যাপারে বরাবরই খুব হেল্পফুল মামাতো দাদা সুনীল। বছরখানেকের বড়ো মেজমামার এই বড়ো ছেলেটির সঙ্গে অনুভার জব্বর ভাব।

সুনীল আবার রৌণককে দাদা বলে। পাড়াতুতো দাদার খেলার একরকম ভক্ত ও।

যেই সুনীলের কানে গেল বোনের মনের কথা, আসরে নেমে পড়ল তৎক্ষণাৎ।

'জানিস রন্টিদা কত ভালো খেলে? এই তো সবে সালকিয়া ফ্রেন্ডসে সই করেছে।'

'রন্টিটা আবার কে রে সুনুদা?' অনুভার কৌতূহলী মন বকবকম করে উঠেছে।

'আরে বাবা তোর হিরো ওই রৌণকদার ডাক নামই তো রন্টি।' সুনীল এবার ঝেড়ে কাশে বোনের কাছে।

ঢ্যাঙা ছেলেটাকে এমনিতেই ভালো লেগে গিয়েছিল। তারওপর ফুটবলার জানার পর থেকে অনুভার ভেতর মেহবুব ব্যান্ড বাজতে শুরু করেছিল।

'তুমি ফুটবলার? কোন পজিশনে খেলো? গোলটোল করো তো? পা বেশি চলে না মাথা? বাঁ পা-টা চলে তো? আর ব্যাকভলি-টা আসে?' প্রশ্নের ফুলঝুরি ছড়াচ্ছিল অনুভা। আরও হয়তো কিছু বলতে যদি না ওর সুনুদা মাঝে থামাত।

'আরে দাঁড়া দাঁড়া, কী এতো জেরা করছিস রন্টিদাকে।'

রন্টি ওরফে রৌণক দেখা গেল মোটেই অসন্তুষ্ট হয়নি। বরং একটা এই বয়সের মেয়ের ফুটবলে আগ্রহ দেখে খানিকটা অবাক হয়ে গিয়েছিল ও।

''তুমি ফুটবলের এতো কিছু জানো? খেলো-টেলো নাকি আবার? আজকাল তো মহিলা ফুটবলারদের খুব রমরমা।' অনুভার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পালটা সওয়াল আরম্ভ করেছিল রৌণক।

সেই শুরু। তারপর থেকে প্রায়ই দুজনের যোগাযোগ হতো। বলাই বাহুল্য সুনুদা ওদের সম্পর্কের মাঝে ব্রিজ হয়েছিল। তখনকার দিনেও আজকের মতো প্রেম-ভালোবাসা এতোটা খুল্লামখুল্লা হয়ে ওঠেনি। কোথায় যেন একটা আড় ছিল। তারওপর কোন্নগর থেকে বেহালা মিনি সাতসমুদ্র তো বটেই।

তবে কথায় বলে ভালোবাসা বড়ো দায়। আর সেই প্রেমের টানেই দেখা হতো দুজনের। কখনও হাওড়া ময়দান চত্বরে আবার কখনও ঢাকুরিয়া লেকে। অনুভার জন্যই একরকম সেকেন্ড হ্যান্ড একটা স্কুটার কিনে ফেলেছিল রৌণক। সেটা নিয়ে কোন্নগরেও চলে আসতে থাকল প্রেমিক পুরুষটি।

আগেই বলা হয়েছে অনুভার বাবা-কাকারা ছিলেন ফুটবল অন্তপ্রাণ। ফুটবলের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য স্থানীয় ক্লাবগুলিতেও তাঁদের বিস্তর পরিচিতি। ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করা, নতুন ছেলে স্পট করে কলকাতার কোনও ক্লাবে প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করা এসব তো তাঁদের বাঁ হাতের খেল।

সেই ক্লাবের ছেলেপুলেরাই খবর দিয়েছিল। অনুভার কাকা বদন চাটুজ্জেকে বাচ্চাবুড়ো সকলেই হোলসেলে বদা'দা বলত।

তাদেরই একজন এসে বলল, 'বদা'দা, আপনার ভাইঝিকে দেখলাম মোড়ের মাথায়। একটা ঢ্যাঙা মতো ছেলের সঙ্গে।'

ব্যাস আর যায় কোথায়? বাড়িতে ফেরামাত্র পুরো লালবাজারি জেরার মুখে পড়ল অনুভা।

প্রথমে এড়িয়ে যাচ্ছিল অনুভা। 'আরে ধুস। ও তো বেহালার মামাবাড়ি পাড়ায় থাকে। সুনুদাদের পরিচিত।'

'সুনুর পরিচিত তো এখানে কী করছে?' মায়ের কথায় যেন আগুন ঝরছে।'

'তুমি একবার ও বাড়িতে ফোন করো তো। কে ছেলেটা?' 'বাবা পালটা মায়ের কোর্টে বল ঠেলছিলেন।'

হঠাৎ করেই অনুভা বলে উঠেছিল, 'আরে ও খুব ভালো ফুটবল খেলে। গোলকিপার। সালকিয়া ফ্রেন্ডসে সই করেছে এবার।'

'কী বললি। ছেলেটা ফুটবলার। আরে আগে বলবি তো।' অনুভার কাকা বদনের কথায় তখন ফর্মে ফেরার আভাস। ওর কাকার এতোটাই প্রভাব ছিল এই চাটুজ্জে বাড়িতে যে তার ওপর অনুভার বাবা রতনও খুব একটা কিছু বলতেন না।

কাকার কথাতেই যথারীতি সিলমোহর পড়ে গেল। রৌণক একদিন সোজা চলে এল ওদের বাড়িতে।

অনুভার সঙ্গে আর কী কথা হবে। বাবা আর কাকা একেবারে গোল হয়ে বসল হবু জামাইয়ের সঙ্গে। কলকাতা লিগ, আইএফএ শিল্ড, রোভার্স, ডুরান্ড হয়ে সেই আলোচনার এক্সপ্রেস বিশ্ব ফুটবলের দিকে।

'কী যে বলো, একটাই তো বিশ্বকাপ দিয়েছে। তাতে মারাদোনাকে সেরা বলতে হবে। পেলের ধারে কাছে আসে নাকি ও?' অনুভার বাবা তখন তাঁর সেরা টপিক পেয়ে গিয়েছেন।

অনুভার কাকা আবার এই ব্যাপারে বরাবরের দাদাবিরোধী। আধুনিকতার ধ্বজা ওড়ানোয় বিশ্বাসী তিনি। মারাদোনার হয়ে জমিয়ে ব্যাটও করল।

এরপর চাটুজ্জেদের মাঠের একজন হয়ে উঠতে আর দেরি হয়নি রৌণকের। পালটি পরিবার দেখেও ওরা সন্তুষ্ট। তাও একটা খচমচ যে ছিল না তা নয়।

সেটা ছিল অনুভার বাবার মধ্যেই। রৌণকের সব ভালো। কিন্তু ব্যাটা পাঁড় ইস্টবেঙ্গল সাপোর্টার। এ বাড়ির জামাই হয়ে কখনও ইস্টবেঙ্গল হওয়া যায় নাকি।

অনুভার মা স্বামীকে বোঝাতেন, 'আরে ওরা তো পূর্ববঙ্গের লোক। ইস্টবেঙ্গল তো হবেই।'

'আরে দাঁড়াও দাঁড়াও আমাকে আর বোঝাতে এসো না। কত বাঙাল আছে আমার চেনাজানা মোহনবাগান অন্তপ্রাণ। ওদের সাফ কথা যে দেশ দেখিইনি তাকে সাপোর্ট করব কেন?'

হবু জামাইয়ের এই ইস্টবেঙ্গলি সমর্থন উপড়ে ফেলতে আবার দাদার অস্ত্র হয়ে উঠেছিল অনুভার কাকা বদন।

মোহনবাগান ক্লাবের অ্যাক্টিভ মেম্বার বলে কথা। ক্লাবের

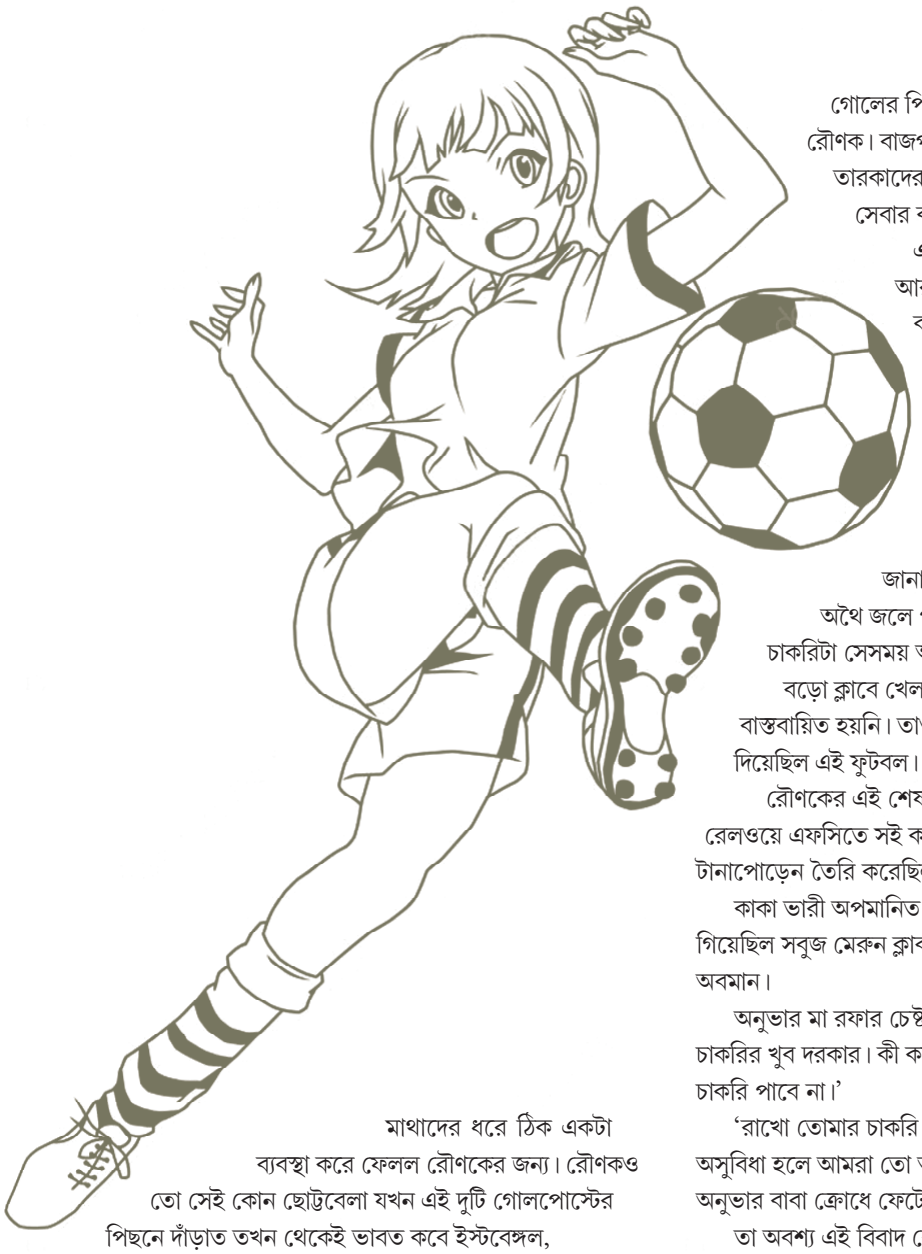

মাথাদের ধরে ঠিক একটা ব্যবস্থা করে ফেলল রৌণকের জন্য। রৌণকও তো সেই কোন ছোট্টবেলা যখন এই দুটি গোলপোস্টের পিছনে দাঁড়াত তখন থেকেই ভাবত কবে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগানে খেলবে। জাতীয় দলের জার্সি গায়ে চড়াবে।

সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে চলেছেন অনুভার কাকা। এ তো বড়ো ভালো ব্যাপার।

সেসময় রৌণকদের পারিবারিক অবস্থা খুবই খারাপ। বাবা সদ্য মারা গিয়েছেন। মা টুকটাক করে চালাচ্ছেন। এমতাবস্থায় একটা চাকরি খুবই প্রয়োজন।

চাকরির ব্যবস্থা করে মুশকিল আসান হয়ে দাঁড়াল রেল দল রেলওয়ে এফসি। হবে নাই-বা কেন। তার ঠিক আগের লিগের মরসুমেই তো কলকাতার তিন প্রধান মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল আর মহমেডানের বিরুদ্ধে সালকিয়া ফ্রেন্ডস অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল।

মোহনবাগানের সঙ্গে ০-০, ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ১-০ জয় আর মহমেডানের বিরুদ্ধে ১-০ এগিয়ে গিয়েও শেষমুহূর্তের বিতর্কিত পেনাল্টি গোলে ১-১ ড্র। বস্তুত সালকিয়া ফ্রেন্ডসের ইতিহাসেও স্মরণীয় বছর সেটা।

গোলের পিছনে দুর্ভেদ্য প্রহরী হয়ে উঠেছিল রৌণক। বাজপাখির মতো ছোঁ মেরে যেভাবে বিপক্ষের তারকাদের পা থেকে বল তুলে নিয়েছিল তা নিয়ে সেবার কাগজেও খুব লেখালেখি হয়েছিল।

এমন একজনকে বড়ো ক্লাব চাইবে তাতে আর অবাক হওয়া কিসে? বস্তুত ইস্টবেঙ্গল কর্তারা রৌণকের জন্য সবার আগে ঝাঁপিয়েছিল। কিন্তু অনুভার কাকার কথাতেই মোহনবাগানে খেলতে রাজি হয়েছিল রৌণক। তাও আবার থার্ড গোলকিপার হিসেবে। শর্ত ছিল একটা চাকরি দিতে হবে।

কিন্তু মোহনবাগান শেষ মুহূর্তে জানাল এই মুহূর্তে চাকরি দেওয়া সম্ভব নয়। অথৈ জলে পড়া রৌণকের জন্য রেলওয়ে এফসির চাকরিটা সেসময় আশীর্বাদ হিসেবে বর্ষাল।

বড়ো ক্লাবে খেলায় সেই যে দাঁড়ি পড়ে গেল পরে তা আর বাস্তবায়িত হয়নি। তাও দুমুঠো খাবারের সংস্থান তো করে দিয়েছিল এই ফুটবল। সেটাই অনেক।

রৌণকের এই শেষ মুহূর্তে মোহনবাগানে যোগ না দিয়ে রেলওয়ে এফসিতে সই করা ওদের সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে একটা টানাপোড়েন তৈরি করেছিল।

কাকা ভারী অপমানিত হয়েছিলেন। তাঁর মাথা নীচু হয়ে গিয়েছিল সবুজ মেরুন ক্লাবটিতে। কাকার অপমান মানেই বাড়ির অবমান।

অনুভার মা রফার চেষ্টা করেছিলেন। 'ছেলেটার সত্যি একটা চাকরির খুব দরকার। কী করবে? মোহনবাগানে খেলে তো আর চাকরি পাবে না।'

'রাখো তোমার চাকরি। আমাদের বাড়ির জামাই। কোনও অসুবিধা হলে আমরা তো আছিই। বদা'র মাথাটা নীচু করে দিল।' অনুভার বাবা ক্রোধে ফেটে পড়ছিলেন।

তা অবশ্য এই বিবাদ বেশিদিন টেকেনি। অনুভার আর রৌণকের চারহাত এক হয়েছিল দু' পরিবারের সম্মতিতেই। রৌণকের চিররুগ্ন মা ততোদিনে প্রয়াত হয়েছেন।

(২)

'গোওওওওওল।' ঋজার তারস্বরে চিৎকারে হুঁশ ফিরল অনুভার। আবারও সেই এক ব্যাপার। কোলবালিশটাকে জোরে কিক করার মধ্যে দিয়ে ঘুম ভেঙেছে মহারানির। ক্লাস ফাইভে পড়া মেয়ের সব ভালো। পড়াশুনাতেও মনোযোগী। কিন্তু ফুটবলের পোকাটা ওর মাথা ঘেঁটে দিচ্ছে।

রাত জেগে লা লিগা, প্রিমিয়ার লিগ দেখা। আর ইস্টবেঙ্গলের খেলা থাকলে তো কথাই নেই। বাপের মতো লাল-হলুদ ন্যাওটা হয়েছে।

'ফুটবল বডি কন্ট্যাক্ট গেম। মেয়েদের খেলার জিনিস নয়। টেবিলটেনিসে ভর্তি করে দেব। মন দিয়ে শিখবি।' অনুভা বরাবর মেয়েকে এভাবে ইন্ডোর গেমসের লক্ষ্মণরেখায় আটকে রাখার চেষ্টা

করছে। কিন্তু মেয়ের সেই এক গোঁ। ওকে ফুটবল শেখাতে হবে।

ছোটো থেকে বাবা-মেয়ে ছোটো একটা বল নিয়ে ঘরের মধ্যে খেলত। কাঁচও ভেঙেছে খানকতক। তাও মেয়ের ফুটবলের নেশা কিছুতেই কাটছে না। কোথায় বড়ো ক্লাস হচ্ছে, নতুন বন্ধু-বান্ধব হচ্ছে। তা নয়। মেয়ের ফুটবলার হওয়ার রোখ চেপেছে।

'বাপ কা বেটি একেই বলে। গোলকিপার বাপের মেয়ে বলে কথা।' অনুভা ঠেস দিয়ে বলে রৌণককে।

'আর ফুটবল বাড়ির মেয়েটা যেন কে?' রৌণকও শোনাতে ছাড়ে না।

এদিকে মেয়ের ফুটবলের প্রতি এতো আসক্তি দেখে প্রমাদ গোনে দুজনেই। পড়াশুনা, টিউশন পড়া সব চলছে। তার পাশে যা পাচ্ছে পায়ের সামনে, লাথিয়ে চলেছে একরত্তির ওই মেয়ে।

সেই তাণ্ডবে জিনিসপত্র তো ভাঙছেই, বেশ কয়েকবার বড়ো অ্যাক্সিডেন্ট থেকে বেঁচেছে।

ফুটবল মনে করে কাঁচের ফুলদানিতে এক লাথি। তারপর পা-টা কেটে একেবারে লঙ্কাকাণ্ড। টিটেনাস নিতে হয়নি অনেক ভাগ্য।

রাস্তাঘাটেও যা পাচ্ছে তাতেই পদাঘাত চলছে। দুর্মতি এমন চরমে পৌঁছেছে যে এ পাড়ার টাউটার কুকুর ডাকুকে একদিন বলের মতো লাথাতে গেছিল ঋজা। সে কুকুরের তাড়া খেয়ে কী অবস্থা!

কোনওমতে ক্লাবঘরে ঢুকে রক্ষে মিলেছিল।

মেয়েকে টেবিলটেনিসে ভর্তি করেও লাভ হয়নি। ওর কোনও ইন্টারেস্টই নেই। বাধ্য হয়ে দুদিন পর ছাড়িয়ে দিতে হয়েছে।

নাচের ক্লাসে দিয়েও সেই এক প্রবলেম।

ডান্স টিচার পরিষ্কার বলেছেন, 'ধুর ধুর। আপনার মেয়ের দ্বারা ক্লাসিক্যাল হবে না। ওকে বরং ফুটবলই শেখান।' কিন্তু মেয়ের ফুটবল খেলায় ভারী আপত্তি অনুভার। প্রথমদিকে রৌণক খুব একটা আপত্তি না করলেও আজকাল কেমন যেন স্ত্রীর পাশেই দাঁড়িয়েছে।

অনুভা রৌণককে বলে, 'ফুটবল খেললে আর ও মেয়ে থাকবে না। টমবয় হয়ে উঠবে।'

ফুটবল নিয়ে এই টানাপোড়েনের মাঝে কদিন হলো একটা অদ্ভুত ব্যাপার শুরু হয়েছে। সেটি আবার কেন্দ্রীভূত হচ্ছে একটি অ্যাপকে ঘিরে। মেয়ের ফুটবল আসক্তির পাশাপাশি এই নতুন উপদ্রবটা আরও চিন্তায় ফেলেছে অনুভাকে। ফেসবুক থেকেই ওই অ্যাপটি কোনওভাবে মেয়ে নাড়াচাড়া করেছে। ওইটুকু মেয়ে হলে হবেটা কী? যুগের হাওয়ার সঙ্গে তালমিলিয়ে স্মার্ট ফোন ঘাঁটাঘাঁটি করতে শিখেছে। ফাঁক পেলেই বাবা, মায়ের মোবাইল নিয়ে শুরু হয়ে যায় গেম খেলা। মাঝেমধ্যে আবার ফেসবুকেও উঁকিঝুঁকি মারে।

এসবের ফাঁকে কখন এই অ্যাপটিকে চোখে পড়ে গিয়েছে। বলা ভালো মনের ভেতর গেঁথে গিয়েছে সেটা। অ্যাপটি নাকি পূর্বজন্মের হালহদিশ দিতে পারে। মানে নির্দিষ্টভাবে বলে দিচ্ছে গত জন্মে কে কী ছিল। এমনকী কার কীভাবে মৃত্যু হয়েছিল সেটার কথাও অক্ষরে অক্ষরে বলে দিচ্ছে নাকি এই অ্যাপটি।

ঋজাই দেখিয়েছে বাবা-মা'কে। 'দেখো বাপি, এই অ্যাপে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে আগের জন্মে আমি কী ছিলাম। এই দেখো এখানে লেখা আছে, 'ঋজা আগের জন্মে খুব বড়ো ফুটবলার ছিল। নাম ছিল রেমন্ড রিটজ। স্পেনের বার্সালোনায় খেলার পাশাপাশি জাতীয় দলের জার্সিও গায়ে চাপিয়েছে। তবে এই ফুটবলের জন্যই আবার...'

'ফুটবলের জন্য কী রে?' শতশত উৎকণ্ঠা ঝরে পড়েছে অনুভার গলায়।

'দেখো না। এখানে বলা হয়েছে রেমন্ড রিটজ মানে আমার মৃত্যু হয়েছিল ফুটবল মাঠেই। বাবার মতো মস্ত গোলকিপার ছিলাম আমি। আর বক্সের ভিতর বিপক্ষ দলের গোল করতে উদ্যত স্ট্রাইকারের পা থেকে বল কেড়ে নেওয়ার সময় চোট পেয়েছিলাম বুকে ও মাথায়। দুদিন কোমায় থাকার পর মারা যাই আমি।' এক নিঃশ্বাসে কথাটা শেষ করে ফুঁপিয়ে ওঠে ঋজা।

ছোট্ট মিষ্টি মেয়েটাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন সত্য সত্যি আগের জন্মে ফিরে গিয়েছে ও। মেয়ের কান্না থামাতে রৌণক আর অনুভা দুজনেই ওকে কাছে টেনে নিল। বোঝাল 'মা, ওটা তো একটা অ্যাপ। মানুষেরই তৈরি। এটা মোটেই সত্যি নয়।'

ঋজা পালটা বলতে ছাড়েনি। 'কই আমার বন্ধুরাও তো এই অ্যাপটা ব্যবহার করেছে। ওদের তো এমন কিছু বলেনি। আমার বেলাতেই কেন এমন হচ্ছে?'

এর উত্তর রৌণক বা অনুভার কাছে ছিল না। এটাসেটা বলে ওকে ভুলিয়ে রাখা ছাড়া।

তবে ফুটবল মাঠে ওভাবে মৃত্যুটা কিছুতেই যেন মেনে নিতে পারছিল না ঋজা। হোক না পূর্বজন্মে। কিংবা হোয়াটসঅ্যাপের জারিজুরিতে। ঘটনাটা কেমন যেন প্রেতাত্মার মতো গ্রাস করেছে ছোট্ট ফুলের মতো মেয়েটাকে। একদিন রাতে 'মা মা' বলে চিৎকার করে সে কী কান্না মেয়ের। একটু পরে সংবিত ফিরলে বাবা-মা-র কাছে ভেঙে পড়ল ও।

'বাপি, মামনি আমি তোমাদের কিছুতেই কষ্ট দিতে পারব না।'

'কেন সোনা কী হয়েছে? মেয়েটাকে বুকে টেনে নিতে নিতে আবেগতাড়িত হয়ে উঠল অনুভাও। রৌণকের দুচোখও ছলছল করছে। শেষমেশ মেয়ে জানাল, 'স্বপ্নে আমার আগের জন্মের বাবা-মা-কে দেখলাম জানো। অবিকল তোমাদের মতো দেখতে। খালি ওদের চুলগুলো পুরো সোনালি রঙের, এই যা। আমার মৃতদেহের সামনে অঝোরে কাঁদছে বেচারিরা।'

একটু থেমে চোখের জল মুছে ঋজা আরও বলল, 'না না। ফুটবল খেলার দরকার নেই আমার। তোমাদের নতুন করে আর কষ্ট দিতে চাই না।' ওইটুকু মেয়ের চোখে বাপ-মায়ের প্রতি আকুতি দেখে নিজেদের সামলে রাখাই তখন কঠিন হচ্ছিল রৌণক-অনুভার।

এখানেই হয়তো সব শেষ হয়ে যেত। কিন্তু একটা খবর না দিয়ে 'দ্য এন্ড' বলতে পারা গেল না কিছুতেই।

সেই ছোট্ট ঋজা এখন অনেকটাই বড়ো। শুধু বড়োই না, এখন সে মস্ত ইঞ্জিনিয়ার। তবে খেলাধুলাতেও তার একটা বর্ণময় উপস্থিতি আছে। এই বছরেই ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছে ঋজা মুখোপাধ্যায়। দাপুটে ওপেনিং ব্যাটসম্যানের পাশাপাশি মহেন্দ্র সিংহধোনির অন্ধ ভক্ত ঋজা কিন্তু তুখোড় উইকেটকিপারও বটে। অনুভা রৌণককে শোনাতে ছাড়ে না, ''বাবার মেয়ে তো। ফুটবল না খেলুক। গোলকিপারের মতোই উইকেটকিপারের গ্লাভস হাতে তুলে নিয়েছে। ◘

উপহার

সিদ্ধার্থ সিংহ

পঁচিশ বছরের বিবাহবার্ষিকীতে ওঁরা এত উপহার পেয়েছেন যে, উপহারের মোড়ক খুলতে খুলতেই ওঁরা ক্লান্ত। তবু তারই মধ্যে একটি ইন্ডাকশন কুকারের প্যাকেট খুলে যখন রিয়া বললেন, বাহ্, খুব ভালো হয়েছে। তখন মায়ের সঙ্গে মোড়ক খোলায় হাত লাগানো তাঁর সতেরো বছরের মেয়ে বলল, কী গো?

রিয়া বললেন, ইন্ডাকশন। তোর টুকিটাকি জিনিসগুলো এ বার থেকে এটাতেই করব। আর এটাতে তো আগুনের কোনও ব্যাপার নেই। ইলেকট্রিকের এবং খুব সেফও। ফলে তুইও এটা ব্যবহার করতে পারবি।

মেয়েকে কখনও আগুনের কাছে যেতে দেন না রিয়া, যাতে মেয়ের গায়ের রং পুড়ে না যায়। জামাকাপড় কাচতে দেন না, যাতে হাতে কড়া পড়ে না যায়। আনাজও কাটতে দেন না, যদি আঙুল কেটে যায়! কিন্তু মেয়ে এসব করতে চায় তার আর পাঁচটা বন্ধুর মতোই। কিন্তু মা করতে দিলে তো! তাই মা যখন বললেন, 'তুইও এটা ব্যবহার করতে পারবি', তখন খুশিতে ডগমগ হয়ে মায়ের পাশে এসে প্যাকেট থেকে বের করে ইন্ডাকশনটা দেখতে লাগল। প্যাকেটের ভিতরে ছিল, কুকারটি কীভাবে ব্যবহার করতে হয়, তার নিয়মাবলি সংবলিত কয়েক পাতার একটি পুস্তিকা এবং তার সঙ্গে দু'-তিনটি কাগজ। মেয়ে সেগুলো দেখতে দেখতে হঠাৎ তার মাকে বলল, এটা কে দিয়েছে গো?

রিয়া বললেন, কেন?

মেয়ে বলল, বিলে তো দেখছি এটা কেনা হয়েছে সতেরো বছর আগে।

রিয়া বললেন, মানে?

মেয়ে বলল, হ্যাঁ, দেখো না, এই তো বিল।

রিয়া অবাক। মেয়ে বলল, কে দিয়েছে? ট্যাগটা কোথায়?

মা ট্যাগ খুঁজতে লাগলেন। আসলে এতগুলো উপহার। তিন দিন ধরে খোলাখুলি চলছে। মোড়ক-টোড়কগুলো, যেগুলো প্রচুর সেলোটেপ মারা, খুলতে গিয়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে, সেগুলোর ছেঁড়া টুকরো যাতে ঘরময় ছড়িয়ে না পড়ে, সেজন্য আগেই উপহারগুলো থেকে ট্যাগগুলো টান মেরে মেরে ছিঁড়ে একটা বড়ো পলিব্যাগে ভরে রেখেছেন। আর যে মোড়কগুলো খোলার পরেও শেষ পর্যন্ত গোটা থাকছে, সেগুলো পাট পাট করে ভাঁজ করে রেখে দিচ্ছেন, কারও জন্মদিনে পেনটেন বা ওই জাতীয় ছোটোখাটো কোনও উপহার দেওয়ার সময় এগুলোর খুব দরকার হয়। তাই রিয়া কোনও উপহার পেলেই মোড়কগুলো সন্তর্পণে খুলে খুব যত্ন করে গুছিয়ে রেখে দেন।

কিন্তু মেয়ে যখন বলল, 'কে দিয়েছে? ট্যাগটা দ্যাখো তো।' তখন তিনি খুব সমস্যায় পড়ে গেলেন। সবগুলোর ট্যাগই তো ওই প্যাকেটে ঠেসেঠুসে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এখন কোন ট্যাগটা এটার সঙ্গে লাগানো ছিল, সেটা বুঝবেন কী করে! আর তার থেকেও বড়ো কথা, সবগুলো উপহারের সঙ্গেই তো আর ট্যাগ লাগানো ছিল না! বিশেষ করে ছোটোখাটো, খুচখাচ এবং কমদামি ম্যাড়মেড়ে উপহারগুলোর সঙ্গে তো নয়ই। তাই রিয়া মনে করার চেষ্টা করতে লাগলেন, এটার সঙ্গে আদৌ কোনও ট্যাগ লাগানো ছিল কি না...

এটা একটু দামি উপহার। যে বা যিনি দিয়েছেন, তিনিই যে এটা দিয়েছেন, সেটা জানানোর জন্য তিনি নিশ্চয়ই তাঁর নাম-ধাম লিখে সুন্দর একটা ট্যাগ এটার গায়ে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। আবার এমনও হতে পারে, কাউকে উপহার দেবেন বলে এক সময় উনি এটা কিনেছিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে আর সেই নিমন্ত্রণে যেতে পারেননি, তাই এত যত্ন করে তিনি এটা তুলে রেখে দিয়েছিলেন যে পরে এটার কথা তাঁর আর মনেই পড়েনি। হয়তো পরিষ্কার-টরিষ্কার করতে গিয়ে কিছুদিন আগে এটার হদিশ পেয়ে ঠিক করে রেখেছিলেন, সদ্য নিমন্ত্রণ পাওয়া ওদের পঁচিশ বছরের অ্যানিভার্সারিতে তো ভালো কিছু একটা দিতেই হবে, ভালোই হলো, এটা দেওয়া যাবে। তাই এটা দিয়েছেন। অনেক দিন আগে কেনা ইন্ডাকশন কুকারটা কেমন আছে, প্যাকেটের ওপর দিয়ে তো আর বোঝার কোনও উপায় নেই, যতই মোড়ক করা থাক, পড়ে থেকে কেমন যেন একটু পুরনো-পুরনো হয়ে গেছে...তাই আর রিস্ক নেননি। উপহার হিসেবে ওটা দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু কে দিয়েছেন, সেটা যাতে বুঝতে না পারে, সেজন্য কোনও ট্যাগই লাগাননি। আর তাঁরা যখন উপহার নিয়েছেন, তখন তো আর ওষুধ কেনার মতো চেক করে নেননি যে, এক্সপায়ারি ডেট পার হয়ে গেছে কি না! তাই...

ভেতর ঘরে ছিলেন রিয়ার স্বামী। বউ-মেয়ে আজও এতক্ষণ ধরে কী করছে, দেখার জন্য এই ঘরে ঢুকতেই তাঁর মেয়ে বলল, বাবা দেখো, তোমাদের কোনো আত্মীয় বাড়িসুদ্ধু নিমন্ত্রিতদের সামনে বড়ো মুখ করে কী সুন্দর একটা পুরনো জিনিস গছিয়ে দিয়ে গেছেন। বাবা জানতে চাইলেন কী?

মেয়ে বলল— ইন্ডাকশন কুকার।

—ভালোই তো কাজের জিনিস।

—আরে বাবা, কাজ করা গেলে তো!

—কেন?

—ধ্যাত, এটা তো সতেরো বছর আগে কেনা।

—সতেরো বছর আগে! বলিস কী?

—হ্যাঁ, এই তো, দেখো না, বিল আছে তো...

—দেখি দেখি দেখি। ওর বাবা বিল হাতে নিয়ে চমকে উঠলেন। বললেন, এটা কে দিয়েছে?

মেয়ে বলল, সেটাই তো বোঝা যাচ্ছে না!

রিয়া বললেন, কেন? তুমি কি তাকে গিয়ে ধরবে নাকি?

—না না আসলে...

—আসলে কী? মেয়ে জিজ্ঞেস করতেই বিলটা মেয়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে ওর বাবা বললেন, বিলটা কার নামে, সেটা ভালো করে দ্যাখ।

মেয়ে হাতে নিয়ে বলল, ওমা, এখানে তো তোমার নাম দেখছি। তার মানে যারা দিয়েছে, তারা কি সতেরো বছর আগে তোমাদের কোনও বিবাহবার্ষিকীতে এটাই দেবে বলে কিনেছিল! কিন্তু তখন কোনও কারণে আর দিতে পারেনি বলে এই সতেরো বছর পরে তোমাদেরই দিল! শুধু তোমাদের নামে কিনেছিল বলে!

ওর বাবা বলল, না না, তা না। এটা আমিই কিনেছিলাম।

রিয়া সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ঘুরিয়ে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি কিনেছিলে মানে? ও, তার মানে তুমি এমন কোনও মহিলাকে নিমন্ত্রণ করেছিলে, লোকজনের সামনে আমাদের বিবাহবার্ষিকীতে খালি হাতে আসার অসম্মানের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তুমি নিজেই তাকে এটা কিনে দিয়েছিলে?

কে সে? অরুণিমা? বিপাশা? না অস্মিতা?

উনি বললেন, কী এ সব যা তা কথা বলছ?

—ও, তুমি যা তা কাজ করতে পারবে, আর আমি বলতে গেলেই দোষ?

—আরে সে সব নয়...

—তা হলে? ও আচ্ছা, দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও। সতেরো বছর আগে! সতেরো বছর! তা হলে কি মেয়ের মুখে ভাতে দেওয়ার জন্য আমাদের নাম করে কেউ এটা কিনেছিল?

—না না, আমার মনে হয়, কেউ বোধহয় সতেরো বছর আগে, সে বিয়েই হোক কিংবা মুখেভাত অথবা বিশেষ কারও জন্মদিন, আমাদের হয়তো নেমন্তন্ন করেছিল। আমরা এই ইন্ডাকশনটা তাদের উপহার দিয়েছিলাম। আমার মনে হয়, কোনও কারণে তারা হয়তো প্যাকেটটাই খোলেনি।

মেয়ে বলল, এমনও হতে পারে, এটা তো কারেন্ট ছাড়া চলে না, যাদের দিয়েছিলে তাদের বাড়িতে হয়তো কারেন্টই নেই।

—কারেন্ট নেই এ রকম বাড়ি আবার আছে নাকি? ওর মা বলতেই মেয়েটি বলল, হয়তো সতেরো বছর আগে ছিল না!

—সে যাই হোক, এটা যে আমি কিনেছিলাম সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। কারণ, বিলটার নীচের বাঁ দিকে আমার সই আছে।

—তোমার সই? তোমার সই লেগেছিল কেন?

উনি বললেন, তখন এই ধরনের কোনও কিছু কিনলে, যিনি বিক্রি করছেন, তাঁকে বিলের ডান দিকে, আর যিনি কিনছেন, তাঁকে বিলের বাঁ দিকে সই করতে হতো। বিশেষ করে গ্যারান্টি পিরিয়ডের জন্য। জিনিসটা কবে তৈরি হয়েছে, কবে গোডাউন থেকে এসেছে, সেটা হিসেব করা হতো না। যেদিন বিক্রি হতো, সেদিন থেকেই গ্যারান্টি পিরিয়ড শুরু হতো। ফলে যিনি বিক্রি করছেন এবং যিনি কিনছেন, তাঁদের দু'জনকেই সই করতে হতো। বলতে পারিস, ওটা ছিল একটা ছোটোখাটো চুক্তিই।

—সে কী! মেয়ের মুখ থেকে অস্ফুটে বেরিয়ে এল।

বাবা বললেন, যাদের দিয়েছিলাম, তারা পুরো প্যাকেটটাই ইনট্যাক্ট রেখে দিয়েছিল। এত বছর পরে তারাই আমার দেওয়া সেই উপহারটাই আমাকে ফিরিয়ে দিল।

মেয়ে বলল, তার মানে, তোমরা যাদের দিয়েছিলে, তাদের নেমন্তন্ন করতে হয় বলে করেছিলে, আসলে তাদের সঙ্গে তোমাদের কোনও সদ্ভাব নেই।

রিয়া বলল, হতে পারে!

স্বামী বললেন, সে রকম কে আছে! কে আছে! কে আছে!

মেয়ে বলল, আবার এমনও হতে পারে, তুমি যাদের দিয়েছিলে, তারা সেটা অন্য কারও বিবাহ বা অন্নপ্রাশনে দিয়ে দিয়েছিল। যাদের দিয়েছিল তারা আবার অন্য কাউকে দিয়েছিল। এই ভাবে উপহার হিসেবে এ হাত ও হাত সে হাত ঘুরতে ঘুরতে আবার তোমাদের হাতে এসে পড়েছে। হতেই পারে!

বাবা বললেন, তুই যে কী বলিস না! কোনও মাথামুণ্ডু নেই। যাই হোক, যে দিয়েছে, তাঁকে তো আর খুঁজে পাওয়া যাবে না!

—একেবারেই যে পাওয়া যাবে না, সে কথা বলো না। ওই দিন তো ভিডিয়ো করা হয়েছিল। সেই ভিডিয়োর ফুটেজ চেক করলেই হয়তো পাওয়া যেতে পারে, কে দিয়েছে।

—পেলেও কী লাভ? পেলে তো আর বলা যাবে না যে, আপনি আমাদের ম্যারেজ অ্যানিভার্সারিতে এটা কী দিয়ে গেছেন? নিয়ে যান। পারলে এর পরিবর্তে অন্য কিছু দিয়ে যান। আমরা এটা নেব না। না পারলে আপনাকে কিছুই দিতে হবে না। তবু এটা নিয়ে যান।

মেয়ে বলল, বাবা...তুমি না...কোনও দিনও পালটাবে না...

রিয়া বললেন, সত্যি...তুমি যে কী বলো না! এ সব আবার বলা যায় নাকি?

উনি তখন মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, তা হলে এটা কী করবি?

অন্য কার একটা উপহারের মোড়ক খুলতে খুলতে রিয়া বললেন, যে ভাবে প্যাকেট করা ছিল, ঠিক সে ভাবেই আবার প্যাকেট করে রাখব।

স্বামী বললেন, কেন?

—কেন আবার? সামনে অমরেশদার বিবাহবার্ষিকী আছে না? সেখানে দিয়ে দেব। দরকার হলে নতুন সেলোফেন পেপার এনে আরও সুন্দর করে একেবারে দোকানের মতো প্যাকেট করে দেব।

মেয়ে বলল, তা দাও, তবে ভুল করেও কিন্তু ওই প্যাকেটের মধ্যে আবার বিলটা ভরে দিয়ো না...

রিয়া বললেন, না না, বিল তো দেবই না। কোনও ট্যাগও লাগাব না। একদম না।

বউয়ের কথা শুনে একটুক্ষণ চুপ করে থেকে স্বামী শুধু বিস্ময়ের সুরে বললেন, আবার? ◘

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,

বোলপুর,

মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

চাঁদিয়াল

সন্দীপ চক্রবর্তী

টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলছে। তবুও ডাক্তার অনিরুদ্ধ সেনের চেম্বারে চাপ চাপ রক্তের মতো অন্ধকার। লালের ওপর কালো ফুটকি দেওয়া ল্যাম্পশেডটাই এর জন্য দায়ী। সুবিমল সেটা জানেন। এই আলো আঁধারি ওকে পাগল করে দেয়। চোখের সামনে দেখতে পান একটা চাঁদিয়াল কেটে যাচ্ছে। আর কে যেন সুবি সুবি বলে চিৎকার করে ওকে ডাকছে। গলার স্বর শুনে সুবিমল চিনতে পারেন না। ওই ডাক যত মাথার ভেতর ঘুরপাক খায় ততই যেন ওর বহুবছর ধরে অপূর্ণ ইচ্ছেটা সাপের জিভের মতো লকলক করে ওঠে।

কতবার সুবিমল ডাক্তার সেনকে বলেছেন, আলোটা সরিয়ে নিন ডাক্তারবাবু। আমি সহ্য করতে পারি না। কিন্তু ডাক্তার সেন শোনেন না। আজও সেই আলোটাই জ্বলছে। আজও চাপ চাপ রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে ঘরটা। সুবিমলের মনে হচ্ছে শয়তানটাকে যদি পেতেন তা হলে এখনই শেষ করে দিতেন।

কী ভাবছেন সুবিমলবাবু? ডাক্তার সেন জিজ্ঞাসা করলেন।

কিছু না।

অখিলবাবুকে খুন করার কথা তা হলে আজকাল আর ভাবছেন না?

সুবিমলের রগের শিরা ফুলে উঠল। বেশ তেরিয়া হয়ে বললেন, তাতে বুঝি আপনার খুব সুবিধা হয়! অখিল আপনাকে কত টাকা ঘুস দিয়েছে? শুনুন ডাক্তারবাবু, আপনি যদি ভেবে থাকেন যে আমায় গাদা গাদা ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ভোঁতা করে দিয়ে অখিলকে বাঁচাতে পারবেন, তাহলে বলব আপনি ভুল করছেন। অখিলকে আমি মারবই। আপনি যত বড়ো সাইকিয়াট্রিস্টই হোন, ওকে বাঁচাতে পারবেন না।

কিন্তু আপনাকে তো আমি অনেকবার বলেছি, অখিলবাবু পাঁচ বছর আগে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন। ওর ডেথ সার্টিফিকেটও আমার কাছে আছে। একজন মৃত মানুষকে আপনি মারবেন কী করে?

প্রচণ্ড রাগে সুবিমল টেবিলে ঘুসি মেরে বললেন, মিথ্যে কথা। ডাহা মিথ্যে কথা। অখিলকে স্পর্শ করার ক্ষমতা ভগবানেরও নেই, বুঝলেন! আমি মারব ওকে। আমি... ওই জাল ডেথ সার্টিফিকেটটা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে নর্দমায় ফেলে দিন।

তাই দিতে হবে দেখছি। আমারও মাঝে মাঝে মনে হয় ওটা জাল। শুধু একটা কথা আমি বুঝতে পারি না।

কী কথা?

অখিলবাবু তো আপনার ছোটোবেলার বন্ধু। তাহলে তাকে আপনি খুন করতে চান কেন?

সুবিমল ভাবলেশহীন চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর বললেন, জানি না। খুন করব শুধু এইটুকুই জানি। কেন করব জানি

না।

ডাক্তার সেন কিছু বললেন না। এই সময়টায় তার সামান্য হলেও হতাশ লাগে। তিন বছর হয়ে গেল তিনি সুবিমলের চিকিৎসা করছেন। আঠারোটা সাইকো-সিটিং হয়ে গেছে। তাতে অনেক নতুন কথা জানতে পেরেছেন ডাক্তার সেন। কিন্তু শেষ জটটা খোলেনি। আজও খুলল না। অথচ এটাই সব থেকে জরুরি প্রশ্ন। কেন অখিলকে খুন করতে চান সুবিমল? এর উত্তর না পাওয়া গেলে চিকিৎসায় সাফল্য আসবে না।

টেবিল ল্যাম্প নিভিয়ে বড়ো আলোটা জ্বেলে দিলেন ডাক্তার সেন। বললেন, ঠিক আছে সুবিমলবাবু। আপনি বাইরে যান। আপনার ছেলেকে পাঠিয়ে দিন।

সুজয় ভিজিটার্স রুমে অপেক্ষা করছিল। বাবাকে বসতে বলে ও ভেতরে গেল। ডাক্তার সেন গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছিলেন। সুজয়কে দেখে বললেন, বোসো সুজয়। তোমার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে। আমার মনে হয় হিপনোসিস করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

হিপনোসিস কাকে বলে সুজয় জানে। ডাক্তার সেনই একদিন ওকে বুঝিয়েছিলেন। এই পদ্ধতিতে বাইরে থেকে পেশেন্টের মনকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তাতে পেশেন্ট খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। এমন অনেক কথা বলে যা স্বাভাবিক অবস্থায় তার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। প্রথম যখন সুজয় হিপনোসিসের কথা শুনেছিল তখন ওর মনে হয়েছিল, এটাই ঠিক রাস্তা। কিন্তু এখন ভয় করে। ডাক্তার সেনের কথায় সেই ভয়টাই ফিরে এল। —কিন্তু ডাক্তারবাবু সেটা কি উচিত হবে? বাবার তো হার্টের অসুখ আছে। হঠাৎ উত্তেজনার বশে বাবা যদি হার্টফেইল করে?

সে কথা আমিও ভেবেছি। কিন্তু খুন করার নেশায় তোমার বাবা যেরকম উত্তেজিত হয়ে থাকেন তাতে এখনও ওর হার্টফেইল করতে পারে। হিপনোসিস মেথডে পেশেন্টের ব্রেইন আর মাইন্ডের কন্ট্রোল যেহেতু তার নিজের হাতে থাকে না, তাই উত্তেজনার অবকাশ কম। আমার মনে হয়, এ ব্যাপারে তুমি মায়ের সঙ্গে কথা বলো। তারপর আমাকে জানাও।

টেনশন বেড়ে গেল। ওর দায়িত্ববোধ সমবয়েসী ছেলেদের থেকে অনেকটাই বেশি। ওদের সংসার চলে সুবিমলের পেনশনের টাকায়। এই অবস্থায় হিপনোসিস করাতে গিয়ে সুবিমলের হার্টের সমস্যা যদি বেড়ে যায় তা হলে দু'ধরনের চিকিৎসা চালানো ওদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

২

প্রতিমা মন দিয়ে সব কথা শুনে বললেন, আমার মনে হয় ডাক্তারবাবু ঠিকই বলছেন। তোর বাবা যেভাবে বেঁচে আছেন তাতে তো ঠিক বাঁচা বলে না।

সুজয় অবাক হয়ে চেয়ে রইল মায়ের মুখের দিকে। প্রতিমা বরাবরই ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। জীবনের উত্থান-পতনে বিচলিত হন না। যুক্তি দিয়ে কথা বলেন। কিন্তু এখন যা বললেন তা কতটা যুক্তিসঙ্গত? সুজয় বলল, কিন্তু মা যদি খারাপ কিছু ঘটে যায় তাহলে কি আমরা কোনওদিন নিজেদের ক্ষমা করতে পারব?

প্রতিমা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, কিছু না করলে মানুষটা একটু একটু করে মরবে আর কিছু করলে মরতেও পারে বেঁচেও যেতে পারে। এই অবস্থায় কিছু করাই ভালো ভাবুন। তাতে অন্তত সান্ত্বনা থাকবে। আমরা চেষ্টা করেছিলাম।

আর ধরো হিপনসিস করাতে গিয়ে বাবার হার্ট ফেইল করল না কিন্তু সমস্যা বেড়ে গেল, তখন দু'রকম চিকিৎসা করানোর টাকা আমরা কোথায় পাব?

আমার যে ক'টা গয়না আছে সেগুলো বিক্রি করে দিবি। এছাড়া আমি তো আর কোনও উপায় দেখছি না।

থমথমে এক নৈঃশব্দের মধ্যে সুজয়কে একলা রেখে প্রতিমা রান্নাঘরে চলে গেলেন।

সুজয়ের মাথায় চিন্তার পাহাড়। আজ তিনদিন হয়ে গেল ও কলেজে যায়নি। সকাল থেকে চান্দ্রেয়ী ছ'বার ফোন করেছে। একবারও ধরতে পারেনি সুজয়। একটু আগে বাড়ি ফিরে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করেছে, বাবাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। রাতে ফোন করব। হিপনোসিসের ব্যাপারটা নিয়ে চান্দ্রেয়ীর সঙ্গে কথা বলা দরকার। ওর মাথা খুব শার্প। দারুণ সব আইডিয়া খেলে। চান্দ্রেয়ীর মত যদি প্রতিমার সঙ্গে মিলে যায় তা হলে সুজয়ের রাজি হওয়া ছাড়া কোনও উপায় থাকবে না।

ওদিকে প্রতিমার চিন্তাও একই খাতে বয়ে যাচ্ছিল। ডাক্তার সেন বারবার যেখানে এসে আটকে যাচ্ছেন, প্রতিমা নিজেও তো সেই জট খুলতে পারেননি। কী হয়েছিল সুবিমল ও অখিলের মধ্যে? অনেকবার কথাটা সুবিমলকে জিজ্ঞাসা করেছেন প্রতিমা। কিন্তু কোনও উত্তর পাননি। শেষে বাধ্য হয়ে একদিন ফোন করেছিলেন আমেরিকায়। সেও বছরখানেক আগেকার কথা। অখিল তখন মারা গেছেন। আশা ছিল অখিলের স্ত্রী মাধুরী এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারবেন। কিংবা ওদের মেয়ে সুমনা— না, কাজে লাগতে পারে তেমন কিছু ওরা বলতে পারেননি। যা বলেছিলেন তাতে রহস্য আরও বেড়ে গিয়েছিল। এখনও সেই রহস্যভেদ করা সম্ভব হয়নি। অখিল নাকি ওর ছেলেবেলা নিয়ে আলোচনা পছন্দ করতেন না। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে বিরক্ত হতেন। এমনকী, ছেলেবেলার সব ছবিও নিজের হাতে ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। মাধুরী আর সুমনা শুধু এইটুকুই জানেন, ছেলেবেলায় অখিলের একজন বন্ধু ছিল। তার নাম সুবিমল। কিন্তু নিজের জীবদ্দশায় অখিল তার সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখেননি।

এসব কথা প্রতিমাই ডাক্তার সেনকে বলেছেন। তখন সুবিমলকে নিয়ে তিনি যেতেন ডাক্তারবাবুর চেম্বারে। ডাক্তার সেন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এমন কেউই কি নেই যিনি ছেলেবেলায় সুবিমলবাবুকে দেখেছেন? বলতে পারেন সেই সময়ের কথা?

প্রতিমা কী উত্তর দেবেন এই প্রশ্নের! কেউই তো নেই। একটু বেশি বয়েসেই বিয়ে করেছিলেন সুবিমল। তাও ওদের বিবাহিত জীবনের বয়েস তেইশ বছর হয়ে গেল। এই সুদীর্ঘ সময়ে সুবিমলদের কোনও আত্মীয়স্বজনকে দেখেননি প্রতিমা। মায়ের দিক হোক বা বাবার দিক— সবদিক শূন্য! আর সেটাই স্বাভাবিক।

সুবিমলরা আদতে পূর্ববঙ্গের লোক। কিন্তু ওরা দেশভাগের পর

এ দেশে আসেননি। এসেছিলেন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পর। ওপারের ভিটেমাটি ছেড়ে ভারতে আসবে বলে বেরিয়েছিল একটা বিরাট দল। সুবিমলের বাবা প্রিয়রঞ্জন আর মা উমার সঙ্গে ছিলেন তিন ছেলে-মেয়ে। আঠারো বছরের পরিমল, পনেরো বছরের কণক আর বারো বছরের সুবিমল। আর ছিলেন সুবিমলের সোনাদাদু, কাকা- কাকিমা এবং মামার বাড়ির দিকের আত্মীয়রা। কিন্তু দাঙ্গাবাজেরা এদের প্রায় সকলকেই খুন করেছিল। সুবিমলকে খড়কুটোর মতো আঁকড়ে ধরে ভারতে পৌঁছেছিলেন প্রিয়রঞ্জন ও উমা।

তারপর দীর্ঘ লড়াই। হাসনাবাদে কিছুদিন থাকার পর প্রিয়রঞ্জন স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে হাওড়ায় চলে যান। সুবিমল স্কুলে ভর্তি হন। ক্লাস সিক্সে। হাওড়াতেই ওর সঙ্গে অখিলের পরিচয় হয়। দু'জনে একই স্কুলে পড়তেন, একই পাড়ায় থাকতেন। অখিলরা অবস্থাপন্ন, সুবিমলরা নিম্নমধ্যবিত্ত। কিন্তু তাতে দু'জনের বন্ধুত্বে ছেদ পড়েনি। প্রতিমা পরে শুনেছেন, ওরা যখন ক্লাস এইটে তখন অখিলের বাবা সুধাময়বাবু দিল্লিতে বদলি হয়ে যান। তারপর আর হাওড়ায় ফিরে আসেননি।

সুতরাং কে বলবে সুবিমলের ছেলেবেলার কথা? হ্যাঁ, প্রিয়রঞ্জন আর উমা নিশ্চয়ই জানতেন। কিন্তু তাদের মুখেও তো প্রতিমা কোনওদিন কোনও ঝগড়াঝাঁটির কথা শোনেননি! ওরা আমৃত্যু সুবিমল আর অখিলের প্রগাঢ় বন্ধুত্বের কথাই বলেছেন। অখিল কেন যোগাযোগ রাখেন না তাই নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। আক্ষেপ করেছেন। দিল্লিতে গিয়ে বদলে যাওয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু কোনওদিন বলেননি অমুক ঘটনার জন্য অখিল বদলে গেছেন। কিংবা বদলে যেতে পারেন।

আর সুবিমল? বিয়ের পর মানুষটার মধ্যে সামান্যতম বিকারও দেখেননি প্রতিমা। পুলিশকে অসম্ভব ভয় পেতেন। এখনও পান। পাড়ায় কোনও কারণে পুলিশ এলে ঘরের ভেতর বসে থাকেন। বিয়ের পর প্রথম প্রথম অনুযোগ করতেন প্রতিমা। পরে ধীরে ধীরে মেনে নেন। ওর এক মামাতো দাদাও তো পুলিশকে খুব ভয় পায়। অর্থাৎ এরকম হয়। অন্তত হতে পারে। আর যাকে নিয়ে এত কথা সেই অখিলবাবুর ব্যাপারে সুবিমলকে কোনওদিন একটিও খারাপ কথা বলতে শোনেননি প্রতিমা। চিরকাল দরাজ গলায় প্রশংসা করেছেন। বিশেষ করে ছাত্র হিসেবে অখিলবাবু কতটা মেধাবী ছিলেন সেটা বলার সময় সুবিমলের বুক যেন গর্বে ফুলে উঠত। চুলের মতো ফাঁকও তো কোথাও রাখেননি সুবিমল, তাহলে প্রতিমা কেন চওড়া ফাটল খুঁজবেন!

রান্নাঘরে কাজ করতে করতে প্রতিমার মনে হলো মসৃণ গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল ওদের সংসারের চাকা। পরিবর্তন এলো প্রিয়রঞ্জন আর উমার মৃত্যুর পর। সে সময় সুবিমল অবসর পেলেই ছাদে গিয়ে বসে থাকতেন। আকাশ দেখতে দেখতে কী ভাবতেন কে জানে! প্রতিমা কিছু বললে বলতেন, মা এই সময় পানের ডাবর খুলে বসত, মনে আছে? কিংবা, জানো প্রতিমা, বাবা আবার ফিরে আসবে। —কিন্তু এরকম সাময়িক বৈরাগ্য তো বাবা-মা-র মৃত্যুর পর অনেকেরই আসে। কেটেও যায়। প্রতিমা গুরুত্ব দেননি। সুজয় তখন ছোটো। প্রতিমারও মানসিক অসুখ সম্বন্ধে কোনও ধারণা নেই। ফলে আন্দাজ করতে পারেননি কিছু। এই সময়েই একদিন স্নান করতে গিয়ে বাথরুমে পড়ে গেলেন সুবিমল। মাথায় চোট লাগল। আর এই ঘটনার দু' একদিন পর প্রথম সুবিমলের মুখে শোনা গেল কথাটা, অখিলকে আমি ছাড়ব না প্রতিমা। তুমি দেখে নিয়ো। প্রতিমা অবাক। এ আবার কী কথা! বারবার জিজ্ঞাসা করলেন, অখিলবাবু কী করেছেন যে তুমি তাকে ছাড়বে না? —কোনও উত্তর নেই। প্রতিমা ভাবতেন হতাশা। অখিলবাবু জীবনে সাকসেসফুল কিন্তু সুবিমল নন— তাই। দিনরাত স্বামীকে বোঝাতেন। ওর মাথা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করতেন। যতদিন চাকরি ছিল এই ভাবেই চলছিল। সমস্যা বাড়ল রিটায়ামেন্টের পর। রীতিমতো হুমকি দিতে শুরু করলেন সুবিমল, অখিলকে আমি খুন করব। ভেবেছে গর্তে ঢুকে বসে আছে বলে বেঁচে যাবে। আমি ওকে গর্ত থেকে বের করে মারব। —তারপর থেকে শুধু মারব মারব আর মারব। কেন মারবেন জানেন না কিন্তু মারবেন। এই জট প্রতিমা খুলতে পারেননি। ডাক্তার সেন যদি পারেন তো খুলুন।

৩

আজ কলেজে দুটোর পর আর কোনও ক্লাস নেই। সুজয় আর চান্দ্রেয়ী ক্যান্টিনে গিয়ে বসল। ডাক্তার সেন যা যা বলেছেন এক এক করে সব কথাই বলে গেল সুজয়। শেষে বলল কেন হিপনোসিসে ওর আপত্তি।

চান্দ্রেয়ী বলল, এবার একটু প্র্যাকটিকাল হ সুজয়। হিপনোসিস ছাড়া যদি অন্য কোনও উপায় না থাকে তাহলে ডাক্তার সেনের প্রস্তাব তো মেনে নিতেই হবে।

কিন্তু এক্সাইটমেন্টের কারণে বাবার যদি হার্ট অ্যাটাক হয়ে যায়? সুজয় জিজ্ঞাসা করল।

সেটা যাতে না হয় ডাক্তার সেন নিশ্চয়ই তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন। হি ইজ আ গুড ডক্টর। জেনেশুনে পেশেন্টের ক্ষতি করবেন না। ইউ শুড ট্রাস্ট হিম।

ডাক্তার সেনের ওপর আমার সম্পূর্ণ ভরসা আছে। কিন্তু কেন জানি না মনে হচ্ছে হিপনোসিস করা হলে খারাপ কিছু একটা হবে।

চান্দ্রেয়ী কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, ওকে ফাইন! সেক্ষেত্রে একটা অন্য কাজ করা যেতে পারে।

কী কাজ?

ডাক্তার সেন হিপনোসিস কেন করতে চাইছেন? কারণ তিনি একটি প্রশ্নের উত্তর চান। বিমলকাকু আর অখিলবাবুর মধ্যে কী হয়েছিল? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা অন্যভাবেও বের করার চেষ্টা করতে পারি। বিমলকাকুরা হাওড়ার যে পাড়ায় ভাড়া থাকতেন আমরা যদি সেখানে যাই এবং বাই এনি চান্স যদি এমন কাউকে পেয়ে যাই যিনি ওদের চিনতেন তা হলে কিন্তু প্রবলেম সলভড।

কথাটা চান্দ্রেয়ী আগেও একদিন বলেছিল। সুজয় তখন গুরুত্ব দেয়নি। এখন ওর মনে হলো চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু একটা সমস্যা আছে। সুজয় বলল, প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার ঘটনা। অত পুরনো লোকজন কি এখন থাকবে?

আরে তুই এখনই এত ভাবছিস কেন? গিয়ে তো দেখি—

স্কুটিতে স্টার্ট দিল চান্দ্রেয়ী। পিছনে সুজয়। সুবিমলরা হাওড়ার ইছাপুরে থাকতেন। বিদ্যাসাগর সেতু দিয়ে যাবার রাস্তা জানা নেই। তাই এরা পুরনো হাওড়া ব্রিজের রাস্তা ধরল।

ইছাপুর মোড় থেকে কাঁটাপুকুর খুব বেশি দূরে নয়। সুবিমলরা এখানেই থাকতেন। কিন্তু সেই কাঁটাপুকুর আর নেই। পুরনো বাড়ি একটাও চোখে পড়ল না। সবই হালফ্যাশনের ফ্ল্যাটবাড়ি। সুজয়ের মনে হলো এসব বাড়িতে যারা থাকেন তাদের পক্ষে পঞ্চাশ বছর আগে ঘটে যাওয়া কোনও ঘটনার কথা বলা সম্ভব নয়।

ফিরে চল চান্দ্রেয়ী। এরা সব নতুন লোক। আমাদের কোনও হেল্পই করতে পারবে না। সুজয় হতাশ হয়ে বলল।

চান্দ্রেয়ী কিছু না বলে একটা বিশাল ফ্ল্যাটবাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একজন বয়স্ক ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে গেল। —এক্সকিউজ মি স্যার। একটা ইনফর্মেশন দিয়ে যদি হেল্প করেন খুব ভালো হয়।

ভদ্রলোক সম্ভবত দোকানে গিয়েছিলেন। হাতে ব্যাগ। বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো কী জানতে চাও।

এমন কোনও লোককে কি আপনি চেনেন যিনি পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে এখানে যারা থাকতেন তাদের কথা জানেন— বলতে পারবেন?

ভদ্রলোক হেসে বললেন, ওভাবে তো বলা যাবে না। তোমরা খুঁজছ কাকে?

সুজয়ের মনে হলো ভদ্রলোকের বয়েস পঁয়ষট্টির কম হবে না। যদি এখানকার পুরনো বাসিন্দা হন তা হলে ওর কাছেই তো সব খবর পাওয়া যেতে পারে। তাই বেশ আশা নিয়ে ও বলল, আমরা অখিল বন্দ্যোপাধ্যায়কে খুঁজছি।

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, না, এ নাম কখনও শুনেছি বলে তো মনে পড়ছে না। আমি অবশ্য এখানে দশ বছর হলো এসেছি।

চান্দ্রেয়ী এতক্ষণ অখিলকে খোঁজার জুতসই যুক্তি সাজাচ্ছিল। আসল কারণটা অচেনা লোকেদের বলা যায় না। —আসলে স্যার অখিলবাবু হিস্ট্রির প্রোফেসর ছিলেন। আমরাও ইতিহাসে এমএ পড়ছি। শুনেছি বল্লালসেনের ওপর অখিলবাবুর খুব ভালো কাজ আছে। আমরা ওর সঙ্গে এ ব্যাপারে ডিসকাস করতে চাই। কিন্তু স্যার আমরা শুধু এইটুকুই জানি যে অখিলবাবু একসময় এখানে থাকতেন। এখন কোথায় থাকেন বা এখনও তিনি বেঁচে আছেন কিনা— সেসব কিছু জানি না। তাই বলছি পুরনো কাউকে যদি পাওয়া যায়—

ডাহা মিথ্যে কথাগুলো ভদ্রলোক বিশ্বাস করলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তোমরা একটা কাজ করো। এই রাস্তা যেখানে বাঁদিকে টার্ন নিয়েছে ঠিক সেই মুখে একটা চায়ের দোকান পাবে। কার্তিকদার চায়ের দোকান। ওর বয়েস কত কেউ জানে না। তবে বরাবর এখানেই আছেন। তোমরা ওকে একবার জিজ্ঞাসা করো।

স্কুটিতে স্টার্ট দিয়ে চান্দ্রেয়ী বলল, সুজয় কুইক!

জায়গাটা বেশি দূরে নয়। বাঁকের ঠিক মুখে অনেকগুলো দোকান। তার মধ্যে চায়ের দোকান একটাই। একজন বৃদ্ধ গ্যাসের ওভেনে চায়ের জল গরম করছেন। এই বৃদ্ধই নিশ্চয়ই কার্তিকদা। দোকানে কোনও কাস্টমার নেই। চান্দ্রেয়ী বলল, চা হবে জেঠু?

কার্তিকদা চশমার ওপর দিয়ে দেখে বললেন, বোসো। দিচ্ছি।

চায়ের গেলাসে চুমুক দিয়ে চান্দ্রেয়ী বলল, আচ্ছা জেঠু, অখিল বন্দ্যোপাধ্যায় বলে আপনি কাউকে চেনেন? উনি পঞ্চাশ বছর আগে এই কাঁটাপুকুরে থাকতেন। অখিলবাবুর যখন তেরো-চোদ্দ বছর বয়েস ওর বাবা দিল্লিতে ট্রান্সফার হয়ে যান। দিল্লি থেকেই অখিলবাবু ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন বলে শুনেছি। পরে চাকরি নিয়ে আমেরিকায় চলে যান। চেনেন জেঠু?

অখিল বন্দ্যোপাধ্যায়! —বৃদ্ধ স্মৃতির সমুদ্রে ডুব দিলেন। অনেকক্ষণ পর বললেন, ওর বাবা কি রেলে চাকরি করতেন?

হ্যাঁ।

মনে পড়েছে। হ্যাঁ, অখিলরা এখানেই থাকত। শীতলা মন্দিরের কাছে ওদের তিনতলা বাড়ি ছিল। দিল্লি চলে যাওয়ার পর ও আর এখানে আসেনি। ওর বাবা একবার এসেছিলেন বাকিটা বিক্রি করতে।

সুজয় বলল, আপনি সুবিমল রায় নামের কাউকে চিনতেন?

সুবিমল— সুবি— হ্যাঁ চিনতাম বই কী! অখিলের খুব বন্ধু ছিল। সুবি দেখতে শান্ত গোবেচারা কিন্তু ওর কোনও জিনিসে কেউ হাত দিলে সাংঘাতিক। একবার আমাদের কালী ওকে না বলে ওর সাইকেলটা নিয়ে দোকানে গিয়েছিল। তাতে রেগে গিয়ে সুবি কালীকে এমন মেরেছিল যে বেচারা দুদিন বিছানা থেকে উঠতে পারেনি।

সুজয় কিছু বলল না। সুবিমলের এই স্বভাবের কথা ও জানে। ছোটোবেলায় ওকেও হাবিজাবি কারণে অনেকবার সুবিমল মারধর করেছেন।

চান্দ্রেয়ী বলল, সুবিমলবাবু বা অখিলবাবুর বাড়িতে কোনওদিন কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছিল জেঠু?

কার্তিকদা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, সুবিদের বাড়িতে কিছু হয়নি। তবে অখিলদের বাড়িতে একবার একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। অখিলের ভাই অতুল ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে ওদের বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে মারা যায়। তখন ওর দশ বছর বয়েস। এটা একটা অ্যাকসিডেন্ট ঠিকই। তবে এই ধরনের ঘটনা তখন প্রায়ই ঘটত। আমার ভাইও তো ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছিল। একতলার ছাদ বলে বড়ো কোনও বিপদ হয়নি।

অতুল যখন পড়ে যায় তখন ছাদে আর কে কে ছিল? সুজয় জিজ্ঞাসা করল।

কে আর থাকবে! অতুল একাই ছিল। সুবি বা অখিল থাকলে কি অতটুকু বাচ্চাকে কার্নিসে উঠে ঘুড়ি ধরতে দিত?

বুক ভরে শ্বাস নিল সুজয়। ক্ষীণ একটা সন্দেহ দানা বাঁধছিল। সেদিন ছাদে সুবিমল ছিলেন না তো? কার্তিকের কথায় স্বস্তি ফিরল।

ফেরার সময় হাওড়া ব্রিজে ট্রাফিক জ্যাম। কার্জন পার্কের কাছে স্কুটি থামিয়ে নেমে ওরা ফুচকা খেল। সন্ধ্যে নামতে আর বিশেষ দেরি নেই। মনুমেন্টের মাথার ওপর মেঘের গায়ে লাল রং।

সেদিকে তাকিয়ে চান্দ্রেয়ী বলল, হাওড়ায় যাওয়াটা পুরোপুরি ব্যর্থ বলা যাবে না, কী বল?

সুজয় কিছু বলল না। হিপনোসিস এবার করাতেই হবে। ওর সব থেকে বড়ো দুই ভরসাস্থল প্রতিমা আর চান্দ্রেয়ী ডাক্তার সেনের পক্ষে। হাওড়ায় তেমন কোনও ক্লুও পাওয়া গেল না। কোন যুক্তিতে সুজয় হিপনোসিস বন্ধ করতে বলবে?

৪

আজও ডাক্তার সেন টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে দিয়েছেন। চাপ চাপ রক্তের মতো ছায়া চেম্বারের সর্বত্র। সুবিমলের মন ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠছে। কিন্তু সে কথা ডাক্তার সেনকে বলে কোনও লাভ নেই। ওই সর্বনেশে আলো তিনি কিছুতেই নেভাবেন না।

রিপোর্ট ফাইলে চোখ বুলিয়ে ডাক্তার সেন বললেন, আজ সুবিমলবাবু আপনি ওই চেয়ারে বসুন। ওই রকিং চেয়ারটায়।

সুবিমল দেখলেন চেয়ারটা। বেশ অবাক হলেন। কত বছর হয়ে গেল এখানে আসছেন। কিন্তু কোনওদিন ওই চেয়ারটা দেখেননি। সম্ভবত আজই আনা হয়েছে। ওরই জন্য আনা হয়েছে কি? হঠাৎ একটা অদ্ভুত ভয় সুবিমলকে পেয়ে বসল। বললেন, রকিং চেয়ারে বসব কেন ডাক্তারবাবু? কী আছে ওতে?

যে কথা আপনি মনে করতে পারছেন না, ওই চেয়ারে বসলে মনে পড়ে যাবে।

অখিল হারিয়ে যাবে না তো?

হারিয়ে তো যাবেই না। বরং আগের থেকে আরও স্পষ্ট দেখবেন।

সুবিমল মন্ত্রমুগ্ধের মতো উঠে দাঁড়ালেন। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে অলস মন্থর ভঙ্গীতে শরীরটা রকিং চেয়ারে এলিয়ে দিলেন।

ডাক্তার সেন তখনই চেয়ার ছেড়ে উঠলেন না। সুবিমলের ইসিজি আর ইকোকার্ডিওগ্রাম রিপোর্টে আর একবার চোখ বোলালেন। সব ঠিক আছে। শুরু করা যায়।

সুবিমল রকিং চেয়ারে আধশোয়া হয়ে বসে স্থির শূন্য দৃষ্টিতে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। কী ভাবছেন কে জানে! ডাক্তার সেন ওর মাথাটা দু'হাতে ধরে ক্লকওয়াইজ এবং অ্যান্টি-ক্লকওয়াইজ ডিরেকশনে কয়েকবার ঘোরালেন। এলোমেলো করে দিলেন সুবিমলের মনের ছন্দ। ধীরে ধীরে পালকের মতো হালকা হয়ে গেল ওর মন। আরামে চোখ বন্ধ করলেন তিনি। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছেন। ডাক্তার সেন ওর কপালের ঠিক মাঝখানে আঙুল রেখে বললেন, আমি আপনার কপালে আঙুল রেখেছি সুবিমলবাবু। কপালের ঠিক কোথায় রেখেছি আপনি বুঝতে পারছেন?

পারছি।

তা হলে মনকে আমার আঙুলের ওপর রাখুন। আমি আঙুল সরাব আপনিও মনকে আঙুলের ডিরেকশনে সরাবেন। পারবেন তো?

পারব।

ডাক্তার সেন আঙুলটা সুবিমলের ব্রহ্মতালুতে রেখে বললেন, আমার আঙুল এখন কোথায় বুঝতে পারছেন?

আমার ব্রহ্মতালুতে।

ভেরি গুড! তার মানে আপনি মনকে একদিক থেকে আর একদিকে সরাতে পারছেন।

হ্যাঁ।

আপনার মনে খুব কষ্ট, তাই না সুবিমলবাবু? কীসের ভয় বুঝতে পারেন না?

না। শুধু দেখি একটা চাঁদিয়াল কেটে যাচ্ছে।

ধরতে ইচ্ছে করে না ওই কেটে যাওয়া চাঁদিয়ালকে?

করে। কিন্তু কীভাবে ধরব?

ধরতে হলে মনকে আপনার অতীতে নিয়ে যান সুবিমলবাবু। মনে করুন আপনি হাওড়ায় আছেন। অখিল আপনার খুব প্রিয় বন্ধু। একই স্কুলে দুজনে পড়েন। মনে করুন আপনি বড়ো হননি। এখনও ছোটো।

সুবিমল মনে করার চেষ্টা করলেন। ডাক্তার সেনের আঙুলগুলো ভারী ভালো। কপালের মাঝখানে মৃদু স্পর্শে বৃত্ত এঁকে চলেছে। মাথার ভেতর কেমন যেন ঘুম-ঘুম ভাব। কিন্তু মন সক্রিয়। সুবিমল আধো ঘুমের মধ্যেই টের পেলেন ওর বন্ধ চোখের অন্ধকার লাল হয়ে যাচ্ছে। লালের ওপর কালো ফুটকি। চাপ চাপ রক্তের মতো ছায়া। কিন্তু বেশিক্ষণ না। সুবিমল স্পষ্ট বুঝতে পারলেন টেবিল ল্যাম্পটা নিভে গেল। আর ঠিক তখনই লাল রং হয়ে গেল বেগুনি। ধাপে ধাপে অন্ধকারের রং বেগুনি থেকে হলো সবুজ। তারপর হলুদ। তারপর সাদা— রঙের খেলা দেখতে দেখতে সুবিমল হঠাৎই দেখতে পেলেন অখিলকে। ক্লাস এইটে পড়া ছোট্ট অখিল। সাদা শার্ট আর কালো ট্রাউজার পরে স্কুলের বেঞ্চে বসে আছে।

ডাক্তার সেন ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলেন, সুবিমলবাবু আপনি এখন কোথায়?

স্কুলে। বারিনবাবুর ক্লাসে। বারিনবাবু আমাদের ভূগোল পড়াতেন। একবার ক্লাসে পড়া পারিনি বলে বারিনবাবু আমায় খুব মেরেছিলেন। ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ছিল। সেদিন মার আমি খেয়েছিলাম। কিন্তু কষ্ট পেয়েছিল অখিল।

অখিল আপনার এত ভালো বন্ধু, তাহলে ওর সঙ্গে ঝগড়া হলো কেন?

সুবিমল খুঁজলেন উত্তরটা কিন্তু পেলেন না। সাদা রংটা বদলে যাচ্ছে। কমলা হয়ে যাচ্ছে চারপাশ। কমলা যেন কীসের রং? সূর্যোদয়ের নাকি সূর্যাস্তের? মনে পড়েছে, সূর্যাস্তের। ওই যে ইছাপুর জলের ট্যাঙ্কের পিছনে হেলে পড়েছে সূর্য। কমলা আলোয় ভরে গেছে আকাশ। আর সেই আকাশ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে একটা চাঁদিয়াল। ওটা আগে সুবিমলের ছিল, এখন কালীর। হাড় হাভাতে বজ্জাত একটা! সুবিমলের সাইকেল ভেঙে দিয়েছিল। মেরে ওর হারগোড় ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু পারেননি। আজ ওর গুমোর ভাঙবেন। উঠে দাঁড়ালেন সুবিমল। ওর চিরবিশ্বস্ত পেটকাটিকে ছুঁড়ে দিলেন আকাশে। অখিলদের ছাদ। অখিল পাশেই ছিল, বলল, আজ থাক না সুবি। সন্ধ্যে তো প্রায় হয়েই

গেল। —সুবিমল বললেন, না। —বলেই পেটকাটিকে চাপিয়ে দিলেন চাঁদিয়ালের ঘাড়ে। তারপর প্রবল একটা টান। চাঁদিয়াল ভোকাট্টা! ঘুড়িটা গোত্তা খেয়ে পড়ল অখিলদেরই বাড়ির পাশে একটা ঝাঁকড়া গাছে। অখিলের ভাই অতুল ঘুড়ি ওড়ানো দেখছিল। চাঁদিয়ালকে গাছের ডালে ঝুলতে দেখে ওটা নেবে বলে কার্নিসের ওপর উঠে হাত বাড়িয়ে দিল। মাথায় রক্ত চড়ে গেল সুবিমলের। ঘুড়িটা ওর। ওই ঘুড়ি তিনি কাউকে দেবেন না। সুবিমল দৌড়ে গিয়ে অতুলকে ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন, ছাড়। সুতো ছাড় বলছি। —ঘুড়ি হারিয়ে ফেলার ভয়ে বাহ্যজ্ঞান লোপ পেল ওর। অখিলের সুবি সুবি বলে চিৎকার শুনতে পেলেন না। এমনকী অতুলের ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া মুখটাও ওর চোখে পড়ল না। শুধু একটা শব্দ শুনতে পেলেন। অনেক নীচে ঝুপ করে কীসের যেন একটা শব্দ হলো।

রকিং চেয়ারের হাতল থেকে হাতদুটো তুলে সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলেন সুবিমল। কী যেন ধরার চেষ্টা করলেন। ধরতে না পেরে বললেন, তুই বিশ্বাস কর অখিল, আমি ইচ্ছে করে কিছু করিনি। আমার নিজের ওপর কোনও কন্ট্রোল ছিল না।

ডাক্তার সেন জিজ্ঞাসা করলেন, ইচ্ছে করে কী করেননি সুবিমলবাবু?

সুবিমল একে একে সব বলে গেলেন। অন্ধকারের রং আবার বদলে গেল। আগুনের মতো রাঙা হয়ে উঠল চারপাশ। ডাক্তার সেন বললেন, অতুল মারা যাবার পর বোধহয় অখিলবাবু আর আপনার সঙ্গে সম্পর্ক রাখেননি, তাই না?

আমি ওকে অনেক বুঝিয়েছিলাম। এমনকী হাতে পায়েও ধরেছিলাম। অখিল আমাকে কথা দিয়েছিল। কিন্তু আমি ওকে বিশ্বাস করতে পারিনি। মনে হতো একদিন অখিল সবাইকে এসব কথা বলে দেবে। তারপর পুলিশ আসবে। আমাকে ধরে নিয়ে যাবে। আমার ফাঁসি হবে।

প্রবল মৃত্যুভয়ের কারণেই কি অখিলবাবুকে খুন করার কথা ভাবতেন?

হ্যাঁ।

কিন্তু এ কাজ আপনি কেন করলেন সুবিমলবাবু?

বিশ্বাস করুন, আমার নিজের ওপর কোনও কন্ট্রোল ছিল না। সব কেমন সাদা। সব ঝাপসা। কেবলই মনে হচ্ছিল যারা দাদাভাই আর দিদিভাইকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে অতুল তাদেরই কেউ। আর ওই চাঁদিয়াল সাধারণ ঘুড়ি না। আমার সেই হারিয়ে যাওয়া দেশ। আমার সোনাদাদুর মুখ। রহমতচাচার জর্দার গন্ধ। আমার ফুলকাকিমার হাসি। আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম ডাক্তারবাবু।

সুবিমলের কপালে বৃত্ত আঁকা থেমে গেল। ডাক্তার সেন দেখলেন সুবিমলের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছে।

অনেকক্ষণ পর চোখ খুললেন সুবিমল। এখনও লাল আর কালোর আলো আঁধারিতে ডুবে আছে ঘরটা। কিন্তু চাপ চাপ রক্তের মতো ছায়ারা নেই। স্মৃতিতে জট ছিল বলে ওরা ছিল। ভয়ের কোনও চিহ্ন নেই আর। ভারী ভালো লাগল সুবিমলের।

বললেন, আচ্ছা ডাক্তারবাবু, অখিল কি সত্যিই নেই?

ডাক্তার সেন ড্রয়ার থেকে একটা কাগজ বের করে বললেন, এটা অখিলবাবুর ডেথ সার্টিফিকেট। পড়লে সব বুঝতে পারবেন।

সুবিমল পড়লেন। প্রতিটি শব্দ প্রতিটি অক্ষর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লেন। তারপর বললেন, ওটা তাহলে একটা অ্যাকসিডেন্টই ছিল, তাই না?

হ্যাঁ। অ্যাকসিডেন্ট। অখিলবাবুও সেটা জানতেন। তাই কাউকে কোনওদিন কিছু বলেননি।

পুলিশ তা হলে আর আসবে না?

না।

আর ফাঁসি?

ফাঁসিও হবে না।

চাঁদিয়ালটাকে বোধহয় আর ধরা যাবে না, না?

যাবে সুবিমলবাবু। চোখ বুজ লেই দেখতে পাবেন। দেখবেন ঘুড়িটা কেটে যাচ্ছে। কিন্তু হারিয়ে যাচ্ছে না।

পরম নিশ্চিন্ত মনে সুবিমল উঠে দাঁড়ালেন, আজ তাহলে আমি আসি—।

ডাক্তার সেন বললেন, আপনি বাইরে অপেক্ষা করুন। আর সুজয়কে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। □

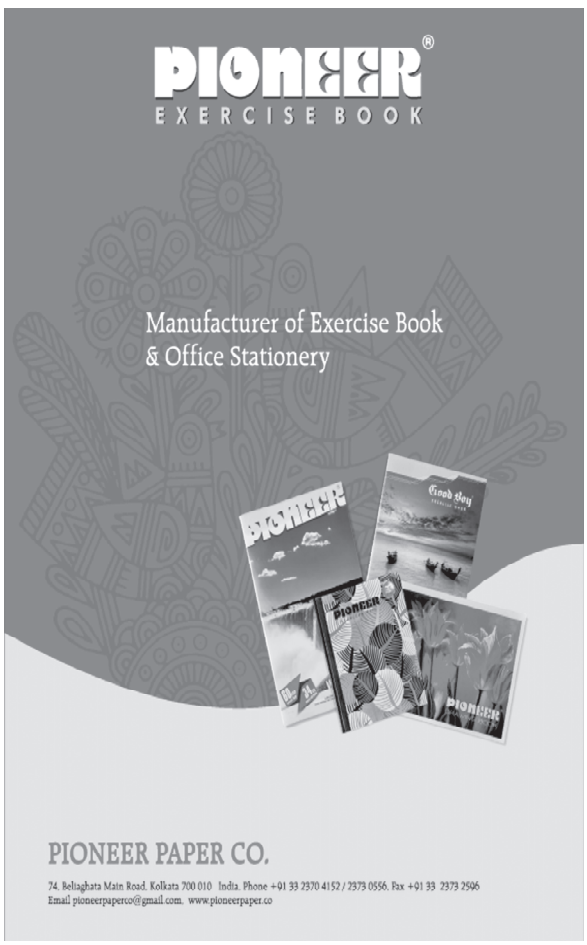

মাননীয়ার অনুপ্রেরণায় রাজ্যের কৃষিব্যবস্থা খাদের অতলে

ড. তরুণ মজুমদার

বাম আমলে এ রাজ্যে বিকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠার তাগিদ থেকে কৃষিজমিগুলিকে টুকরো টুকরো করে প্রচুর মালিক সৃষ্টি করার মাধ্যমে সার্বিকভাবে উৎপাদন দক্ষতা, প্রতিযোগিতা ও উৎপাদনশীলতা সুচারুভাবে হ্রাস করার স্বাভাবিক ফলশ্রুতিতেই অত্যন্ত সামান্য সম্বল নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে কৃষক ভাইদের কাজ চালাতে হয়। তাছাড়া করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে শিল্প-কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্যের মতো জীবিকার্জনের অন্যান্য পথ অবরুদ্ধ হওয়ার কারণে কৃষিকার্যে জনসংখ্যার অতিরিক্ত ভিড় স্বাভাবিকভাবেই কৃষিকে অলাভজনক করে তুলছে। কৃষকদের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমশ তলানিতে এসে ঠেকেছে। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি এ রাজ্যের কৃষকদের এই নিদারুণ ক্ষতে প্রলেপ লাগাতে পারতো, কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর তুঘলকি আচরণ, দম্ভ ও অপরিণামদর্শী রাজনীতি এই ক্ষত মেরামতের সমস্ত সুযোগ নষ্ট করে রাজ্যের অন্নদাতা কৃষক সমাজের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারের অতল গহ্বরে তলিয়ে দিচ্ছে। নতুন প্রণীত কৃষি আইনের বিরোধিতার নামে তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকার অত্যন্ত সুকৌশলে বিগত দশ বছর ধরে কৃষিক্ষেত্রে হয়ে চলা পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি থেকে সমাজের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে চাইছে। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করে এবং অপরিসীম তোলাবাজি, স্বজনপোষণ ও কাটমানি সংস্কৃতির আরাধনা করে কৃষি দপ্তরকে আক্ষরিক অর্থেই দুর্নীতির বাস্তুঘুঘুতে পরিণত করা হয়েছে।

বর্তমানে রাজ্যের সেচ সেবিত এলাকা, চাষযোগ্য এলাকার প্রায় ৭৫ শতাংশ কাগজে-কলমে দেখানো হয়। বাস্তবে এই সেচব্যবস্থা চাষযোগ্য জমির ৫০ শতাংশের কম। খুব কম করে হলেও গোটা রাজ্যে খারিফ মরশুমের তুলনায় শীতকালীন মরশুমে অন্তত এক তৃতীয়াংশ এলাকায় চাষ কম হয়। নতুন সেচ ব্যবস্থার কোনো রকম পরিকল্পনা বা সদিচ্ছাই তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকারের নেই। কেন্দ্রীয় প্রকল্পে নির্মিত ডিপটিউবওয়েলগুলির বেশিরভাগই খারাপ হয়ে রয়েছে এবং একইসঙ্গে রিভার লিফট ইরিগেশনগুলির প্রায় সবকটি

কর্মসংস্থানের বদলে প্রতিবছর কৃষিমেলা ও মাটি উৎসবের নামে কোটি কোটি টাকার নয়-ছয় চলছে। এই মেলা ও উৎসবে সন্ধ্যার সময় নাচ-গান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখতে সাধারণ মানুষের যে জমায়েত হয়, আধিকারিকরা সেই সংখ্যাকে কৃষকের সংখ্যা বলে দপ্তরে রিপোর্ট দেন।

শাসকদলের তল্পিবাহকদের মাথায় রেখে গঠিত হওয়া বেনিফিসিয়ারি কমিটিকে হস্তান্তর করা হয়েছে। সেখানেও কোনোরকম রক্ষণাবেক্ষণ নেই। কেন্দ্রীয় প্রকল্পে তৈরি বড়ো বড়ো সেচ ব্যবস্থাগুলিকে ইচ্ছাকৃতভাবে ধ্বংস করে দিয়ে কৃষকদের ছোটো পাম্প-সেট কিনতে বাধ্য করার মাধ্যমে ব্যবসায়িক দুর্নীতি শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছেছে।

ওয়েস্টবেঙ্গল এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে এবং বাকি সমস্ত কৃষি উপকরণ যেমন বীজ, সার, অনুখাদ্য, কীটনাশক ইত্যাদি সরবরাহ করে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট সিড কর্পোরেশন। বিপুল অর্থের বিনিময়ে উপরওয়ালাকে তুষ্ট করে WBSSC-এ নাম এনলিস্ট করাতে হয়। এরপর আসে টেন্ডারে অংশগ্রহণের পালা। সেখানেও আবার প্রচুর পরিমাণ কাটমানি। কেউ একজন সিলেক্টেড হলে তার থেকে উপকরণটি নিয়ে ব্লকে ব্লকে পৌঁছে দেওয়ার কথা WBSSC-র, কিন্তু অত্যন্ত দেরি হয় বলে কোম্পানি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিজের দায়িত্বে উপকরণ ব্লকে ব্লকে পৌঁছে দেয়। অথচ অদ্ভুতভাবে দেখা যায় WBSSC যখন বিল জমা দেয় তখন লোডিং আনলোডিং বাবদ মূল দামের উপর আরও কুড়ি শতাংশ দাবি করে বসে। ফলে খোলাবাজারে কৃষি যন্ত্রপাতি বা অন্যান্য কৃষি উপকরণ যে মূল্যে পাওয়া যায় তার থেকে এই দুটি সংস্থা হতে প্রাপ্ত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য কৃষি উপকরণের দাম অনেক বেশি। দীর্ঘদিন ধরে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট সিড কর্পোরেশনের ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজারের পদগুলিতে আলাদাভাবে নিয়োগ না করে অদ্ভুতভাবে কৃষি দপ্তর থেকে বেছে বেছে

চূড়ান্ত দুর্নীতিগ্রস্ত আধিকারিকদের বহাল করা হচ্ছে তোলাবাজি সিস্টেমের স্বার্থে।

রাজ্যের কৃষকদের বার্ষিক গড় আয় ভারতবর্ষের কৃষকদের গড় বার্ষিক আয়ের প্রায় আড়াই থেকে তিন গুণ বেশি দেখানো হয় যা অত্যন্ত হাস্যকর। বিকৃত মানসিকতা নিয়ে মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে ফসলের এলাকা এবং ফসলের ফলন, এই দুটি বিষয় অত্যন্ত বেশি করে দেখানো হয়। এই নির্লজ্জ মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে পাওয়া কৃষিকর্মণ পুরস্কারের জন্য পরোক্ষভাবে আমাদের রাজ্যের কৃষক ভাইয়েরা বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অনেকগুলি কেন্দ্রীয় প্রকল্প যেমন এনএফএসএম, বিজিআরইআই, আরকেভিওয়াই, এসএমএএম প্রভৃতি থেকে কৃষি যন্ত্রপাতির অংশটি অর্থ-সহ আলাদা করে নিয়ে একসঙ্গে করে নিজেদের নামে রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ অনৈতিকভাবে এফএসএসএম (ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট স্কিমস্ ফর ফার্ম মেকানাইজেশন) নামে একটি নতুন প্রকল্প চালু করে। এই প্রকল্পের নিয়ম অনুযায়ী কৃষক অনলাইনে কৃষি যন্ত্রপাতির জন্য আবেদন করেন এবং পুরো অর্থ দিয়ে আবেদনপত্র অনুযায়ী যন্ত্রটি ডিলারের থেকে কিনতে হয়। এরপর যন্ত্রটির geo-tagging সম্পন্ন হওয়ার পর কৃষকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সাবসিডির টাকা পাঠানো হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় সাবসিডির অর্থ কৃষকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢোকার পর খরিদকৃত কৃষি যন্ত্রটি পুনরায় ডিলারের কাছে ফেরত চলে যায় এবং সাবসিডির টাকা কৃষক, ডিলার এবং তৃণমূলের জনপ্রতিনিধির মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা হয়ে যায়। দুর্নীতিবাজ তৃণমূল সরকারের প্রত্যক্ষ যোগসাজশে দিনের পর দিন এইভাবে সাধারণ মানুষের ট্যাক্সের টাকা নয়-ছয় হয়ে চলেছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের এনএফএসএম প্রকল্প এবং বিজিআইইআই নামক প্রকল্প দুটিতে কৃষকদের জন্য বহুবিধ সুবিধা প্রদান করা হয়। বিশেষত এই প্রকল্প দুটির মাধ্যমে ৫০ হেক্টর বা ১০০ হেক্টর এলাকা নিয়ে কয়েকটি করে ধান, গম, ডাল বা তৈলবীজের প্রদর্শনী ক্ষেত্র প্রতিটি ব্লকে বরাদ্দ করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গের প্রায় তিন লক্ষ আবেদনকারী কৃষক যারা বুলবুলের তাণ্ডবে প্রকৃত অর্থেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন, তারা আজও বুলবুলের ক্ষতিপূরণের টাকা পাননি। অথচ শাসকদলের অনুপ্রেরণায় আবেদন করে টাকা পেয়েছেন এবং বাস্তবে দেখা গেছে প্রচুর মানুষ যারা কৃষিকাজের সঙ্গে আদৌ যুক্ত নন তারাও বুলবুলে আবেদন করে ক্ষতিপূরণের টাকা পেয়েছেন।

এই প্রদর্শনী ক্ষেত্রের জন্য বীজ, সার, অনুখাদ্য, রোগ পোকার ঔষধ সব কিছুই বিনামূলে সরকার থেকে দেওয়া হয়। আমাদের রাজ্যে ভূমি সংস্কারের কারণে ক্ষুদ্র প্রান্তিক কৃষকের সংখ্যা বেশি হওয়ার দরুন এক জায়গায় ৫০ বা ১০০ হেক্টর জমি পাওয়া অসুবিধাজনক। সে কারণে পূর্বে স্থানীয় পঞ্চায়েতের সঙ্গে কথা বলে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে এই সমস্ত সুবিধা ভাগ করে দেওয়া হতো। আগে কৃষকেরা অফিসে এসে সই করে উপকরণগুলি নিয়ে যেতেন। কিন্তু বর্তমানে তিন চারজন স্থানীয় তৃণমূলের নেতা এসে পুরো গ্রাম পঞ্চায়েতের উপকরণ নিয়ে যান। পরবর্তীকালে ফিল্ড ভিজিটে গিয়ে মাঠে কোনো কিছুরই হদিস মেলে না। অর্থাৎ সব উপকরণ খোলা বাজারে বিক্রি হয়ে যায়।

পশ্চিমবঙ্গের প্রায় তিন লক্ষ আবেদনকারী কৃষক যারা বুলবুলের তাণ্ডবে প্রকৃত অর্থেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন, তারা আজও বুলবুলের ক্ষতিপূরণের টাকা পাননি। অথচ একই ব্যক্তি শাসকদলের অনুপ্রেরণায় একাধিকবার আবেদন করে এই টাকা পেয়েছেন এবং বাস্তবে দেখা গেছে প্রচুর মানুষ যারা কৃষিকাজের সঙ্গে আদৌ যুক্ত নন তারাও বুলবুলে আবেদন করে ক্ষতিপূরণের টাকা পেয়েছেন।

সয়েল হেলথ ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পটির দিকে তাকালেও সেই একই চিত্র। এই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো মাটিতে গাছের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি কী পরিমাণে আছে তা নির্ণয় করা এবং তার ভিত্তিতে রাসায়নিক সারের পরিমাণ নির্ধারণ করা। প্রতিটি জেলার পরীক্ষাগারে মাটির নমুনা সংগ্রহ করে পাঠানোর পরে মাটির রাসায়নিক পরীক্ষা করা হয় কিন্তু অদ্ভুতভাবে সেই রিপোর্ট চাষিদের সরাসরি দেওয়ার অধিকার পরীক্ষাগারের হাতে নেই। এই রিপোর্ট কলকাতায় প্রেরিত হয়। ইন-গ্রিনস্ নামে একটি বেসরকারি সংস্থা সেই রিপোর্টটি কালার প্রিন্টারে প্রিন্ট করে পুনরায় জেলায় পাঠিয়ে দেয়। সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয়টি হলো, মাটির নমুনা সংগ্রহ করা থেকে রাসায়নিক বিভিন্ন পরীক্ষা করা পর্যন্ত প্রতিটি নমুনা পিছু সরকারি বরাদ্দ মাত্র চল্লিশ টাকা অথচ রিপোর্ট কালার প্রিন্টারে প্রিন্ট করে জেলায় পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য ইন-গ্রিনস্ সংস্থা নমুনা পিছু পায় পঞ্চাশ টাকা করে। প্রতিটি জেলা থেকে মাত্র ১ লক্ষ করে নমুনা পরীক্ষা করা হলে এই বেসরকারি সংস্থাটি কত পরিমাণ অর্থ পেতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে।

সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেম তৈরির মাধ্যমে এগ্রিকালচার এক্সটেনশন সার্ভিস প্রতিটি কৃষকের কাছে যথার্থভাবে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি নামক কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে টাকা রাজ্যের কাছে আসে এবং রাজ্য থেকে সেই অর্থ জেলায় জেলায় বরাদ্দ করা হয়। এই প্রকল্পের আওতায় ব্লক টেকনোলজি ম্যানেজার, এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি ম্যানেজার এবং কৃষক বন্ধু পদে নিয়োগের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল

বিটিএম, এটিএম পদে যাদের নিরোগ করা হয়েছে তাদের প্রতি মাসে সঠিক সময়ে মাস মাইনে দেওয়া হয় না, উপরন্তু তারা পুজোর বোনাস পান না। কৃষক বন্ধু পদে যাদের নেওয়া হয়েছিল জেলায় জেলায় বা গ্রামে গ্রামে, তাদের নিয়োগপত্র কোনো অজানা কারণে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। মেলা-খেলা-মোচ্ছবের এই তৃণমূলি সরকার কেন কৃষক বন্ধুদের নিয়োগ বাতিল করল, আজও তার সদুত্তর পাওয়া গেল না।

দেশের অন্যান্য রাজ্যের আদলে একই কায়দায় আমাদের রাজ্যের কৃষকদের ফসল বিক্রির সুবিধার জন্য প্রায় ১৭৭টি কিষান মান্ডি তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি নীল সাদা রঙের মান্ডি পিছু খরচ প্রায় ৫ কোটি টাকা। মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের আর কে ভি ওয়াই প্রকল্পের অ্যাসেট বিল্ডিংয়ের টাকা আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যেই এই পরিকল্পনা রাজ্যে বাস্তবায়িত করা হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের ২০১১ সালের নির্বাচনী ইস্তেহারে সরকারি কৃষি খামারগুলির উন্নতিসাধন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করার কথা বলা হয়েছিল। অথচ বাস্তবে আমরা দেখলাম রাজ্যের কৃষি খামারগুলির উর্বর কৃষি জমি নষ্ট করে এবং সমস্ত রকম নিয়োগ বন্ধ রেখে সেখানে নীল সাদা রংয়ের কিষান মান্ডি তৈরি করা হলো। বেশিরভাগ কিষান মান্ডি মূল বাজার থেকে অনেক দূরে অবস্থিত, সেখানে যাতায়াতের রাস্তাও ভীষণ খারাপ, পরিকাঠামো অত্যন্ত শোচনীয়। ফলত কৃষকেরা এখানে যেতে চান না। রাজ্যের প্রায় প্রতিটি কিষান মান্ডিতে বর্তমানে কিছু সরকারি অফিস ভাড়া দেওয়া হয়েছে।

কৃষি-খামারগুলির উর্বর কৃষিজমি শুধুমাত্র কিষান মান্ডি করেই নষ্ট করা হয়নি সেখানে বিভিন্ন জায়গায় আইটিআই কলেজ, কর্মতীর্থ প্রভৃতি নাম দিয়ে কিছু বিল্ডিং সম্পূর্ণ পরিকল্পনাহীন ভাবে যত্রতত্র নির্মাণ করে কৃষি খামারগুলির সর্বনাশ করা হয়েছে। কৃষি খামারের এই উর্বর কৃষিজমিগুলি সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত ছাড়াই খাম-খেয়ালি ভাবে অন্যান্য দপ্তরকেও হস্তান্তর করা হয়েছে।

পার্টির তোলাবাজ লবির প্রত্যক্ষ মদতে রাজ্যের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় দুটিতে দলীয় অন্তর্কলহ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে বিশ্ববিদ্যালয় দুটিতে পঠনপাঠন, গবেষণা প্রায় সম্পূর্ণভাবে স্তব্ধ। সেখানে উন্নয়নের নামে কাটমানি শিল্পের রমরমা চলছে। প্রতিবাদী আধিকারিক এবং শিক্ষকদের অনৈতিকভাবে প্রমোশন বন্ধ রেখে দেওয়া, চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দেওয়া এবং কোনোরকম কারণ ছাড়াই দূরে দূরে বদলি করা রোজকার রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা- খামারগুলির জমিও বলপূর্বক বিক্রি করে দেওয়ার বন্দোবস্ত চলছে। এখানেই না থেমে, বিশ্ববিদালয়ের কিছু জমি কাটমানিখোর স্থানীয় নেতাদের মদতে জবরদখল করে সেখানে জমির পাট্টা বিলি পর্যন্ত করা হয়েছে। গড়ে উঠছে 'হঠাৎ কলোনি'।

কৃষিমেলা ও মাটি উৎসব, তৃণমূল সরকারের মস্তিষ্কপ্রসূত নির্লজ্জতার আরও একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। রাজ্যে যেখানে কর্মসংস্থান প্রায় তলানিতে, সারাদেশে যখন আমাদের রাজ্য পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যায় প্রথম স্থান অধিকার করে বসে আছে (সংখ্যায় প্রায় ৪২ লক্ষ), সেখানে কর্মসংস্থানের বদলে প্রতিবছর কৃষিমেলা ও মাটি উৎসবের নামে কোটি কোটি টাকার নয়-ছয় চলছে। এই মেলা ও উৎসবে সন্ধ্যার সময় নাচ-গান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখতে সাধারণ মানুষের যে জমায়েত হয়, আধিকারিকরা বাধ্য হয় সেই সংখ্যাকে কৃষকের সংখ্যা বলে দপ্তরে রিপোর্ট দিতে। নির্লজ্জতার সমস্ত সীমা-পরিসীমা অতিক্রম করেছে এই সরকার।

প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক আদর্শ রহিত এবং শুধুমাত্র মিথ্যা, ছলচাতুরী ও কাটমানি সংস্কৃতিকে আধার করে পথ চলা একটি আঞ্চলিক দলের থেকে এর থেকে ভালো কিছু আশা করাটা আত্মপ্রবঞ্চনার-ই শামিল। অনতিবিলম্বে এই নোংরা সংস্কৃতির সমূলে বিনাশ ঘটুক; ভয় মুক্ত গণতান্ত্রিক প্রতিরোধের মাধ্যমে ভেসে যাক সব কলুষতা। পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং সমাজ-মননে নতুন প্রাণ সঞ্চার হোক। □

পূর্বাঞ্চলের বনবাসী ভাই-বোনদের বাঁচাতে হবে

অসীম বিশ্বাস

ওদের দিকে চোখ তুলে তাকানোর সময় আমরা পাইনি, সামনে পড়লে নাক সিটকে দূরে সরে গিয়েছি। কারণ ওরা বনবাসী, স্থানীয় ভাষায় ওদের জংলির তকমা দিয়েছি! সুদূর ইউরোপ কিংবা আমেরিকা থেকে খ্রিস্টান মিশনারিরা পৌঁছে গেছে ওদের গ্রামগুলিতে, যে গ্রামগুলিকে আমরা কখনো গণনায় আনিনি। হাজার বছরের নিজস্ব উপাসনা পদ্ধতি, ধর্মকে জলাঞ্জলি দিতে শিখিয়েছে বিদেশিরা। বিভিন্ন কৌশলের প্রয়োগ করেছে। দারিদ্র্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা, তথাকথিত দেশের শিক্ষিত সভ্য সমাজের বঞ্চনা, সর্বোপরি সরকারের উদাসীনতা পেয়েছে এরা। ফলে বেড়ে গেছে তাদের সঙ্গে আমাদের দূরত্ব। ওই দূরত্বের পুরোপুরি সুযোগ নিয়েছে বিদেশিরা। গত তিনশো বছরে ভারতবর্ষের অনেক গ্রাম ও জনপদে বিদেশিরা শিকড় গেড়েছে পাকাপোক্ত ভাবে। আজ সেই রাজ্যগুলিতে দেশ বিরোধী বিভিন্ন কার্যক্রমের বাড়বাড়ন্তই নয়, ভিন রাজ্যের নাগরিকদেরও সেখানে ভয়ে ভয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে। এসবের জন্য আমাদের অনুশোচনা নেই। আমরা নিষ্ক্রিয়, শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে আত্মসুখে মগ্ন থেকে গেছি। ভেবেছি আমরা করতে যাবো কেন, এতে আমাদের লাভ কোথায়? আমরা এই লাভের অঙ্ক কষতে কষতে কখন যে গরিব বনবাসীদের শিকড় কেটে ফেলছি, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়ার সময়ই পাইনি।

করিমগঞ্জ জেলার রাতাবাড়ি বিধানসভার দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে অনেক বনবাসী গ্রাম রয়েছে। মিজোরাম ও ত্রিপুরা সীমান্তবর্তী ওই গ্রামগুলিতে মূলত ব্রু রিয়াংদের বসবাস। এছাড়া নেপালি ও খাসিয়া কিছু পরিমাণে রয়েছেন। কাঠলিছড়া, ধলাই, পাথারকান্দি এলাকায় বহু সংখ্যক বনবাসীরা রয়েছেন। এদের সিংহভাগই বর্তমানে ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান। বেশ কয়েক বছরে রাতাবাড়ির দক্ষিণাঞ্চলে কিছু রাষ্ট্রবাদী সংগঠন পৌঁছলে কঠিন বাস্তব রূপ ধরা পড়ে অনেকের চোখে। কোথাও শতাব্দী প্রাচীন তো কোথাও দীর্ঘ কয়েক দশক থেকে বসবাস করা বনবাসীদের বাস্তব জীবনযাত্রার একটি চিত্র ভেসে উঠে। যোগাযোগ ব্যবস্থা সেই মান্ধাতা আমলের। এখনও অধিকাংশ গ্রামে যেমন বিদ্যুৎ নেই, তেমনি নেই সাধারণ মানের রাস্তা। কয়েকটি গ্রামের কথা এখানে উল্লেখ করতেই হয়। এরমধ্যে অন্যতম মনাফি, গুয়াউরা, লালগেনাই, রণপুর, ছোটো ভুবিরবন্দ, বড়ো ভুবিরবন্দ, শর্মাপা বস্তি, বিষ্ণুরাম বস্তি, শ্রীরামপুর টাঙ্গিয়া বস্তি, গম্ভীরা খাসিয়া পুঞ্জি, সকলপুর, ভুতুছড়া বর্মণ বস্তি ইত্যাদি। অধিকাংশ গ্রামের লোকের জীবিকা সেই প্রাচীন জুমচাষ, রেমার ব্যবসা, শিকার বা স্বল্পমূল্যে মজদুরি। এছাড়া মায়েরা নিজ পরম্পরার কাপড় তৈরি করেন। সেটা একটা জীবিকা। বনবাসীদের মধ্যে এখনও মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা বিদ্যমান। খ্রিস্টান হওয়ার পর অধিকাংশ রিয়াং বনবাসীরা ভুলতে বসেছেন নিজেদের পারম্পরিক হোজাগিরি নৃত্য। নেপালিরা তাদের ভাইদোজ কিংবা দেউসি ভুলে গিয়ে মেতে উঠছেন বড়োদিনে। খাসিয়া, বর্মণ, চাকমারা নিজস্ব সংস্কৃতি ভুলে ধার করা বিদেশি সংস্কৃতিকেই আপন করে নিচ্ছেন।

করোনা সংক্রমণের প্রথমদিকে যখন মানুষ নিজের কাজকর্ম ছেড়ে জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে ঘর থেকে বের হচ্ছিলেন না, তখন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, বনবাসী কল্যাণ আশ্রম ইত্যাদি সংগঠনের কার্যকর্তারা ওদের কাছে পৌঁছতে শুরু করে। যদিও অনেক আগে থেকেই ওদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু। গ্রামে বাসন্তী দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হলে পারিপার্শ্বিক এলাকার বনবাসী ভাই-বোনেরা সার্বিক অংশগ্রহণ করেন। সেক্ষেত্রে ওই গ্রামের এক বনবাসী ভাইদের কথা উল্লেখ করতে হয়। রতনজয় রিয়াং নামের ভদ্রলোক দীর্ঘদিন থেকেই বনবাসী কল্যাণ আশ্রমে কাজ করে যাচ্ছেন। ওই পুজো আয়োজনে তাঁর ভূমিকা অন্যতম।

এরপর থেকেই স্থানীয় কিছু মানুষের সহায়তায় শুরু হয় বিভিন্ন সেবাকাজ। ২০১৮ ও ২০২০ সালে সেখানে পরপর দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৯ ও ২০২০ রণপুর ও চেরাগী অঞ্চলে বনবাসীদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। প্রায় পাঁচশো বনবাসী এতে উপকৃত হয়। ২০২০ ও ২০২১ অন্য রাজ্যের চিকিৎসক দিয়ে দুটি চিকিৎসা শিবিরের অনুষ্ঠিত হয় বিরজাপুর ও রণপুরে। দুটি শিবির মিলে প্রায় চার শতাধিক বনবাসী উপকৃত হন। সক্ষম ও দিব্যাঙ্গ সংস্থা চেরাগী অঞ্চলে একাধিক বার শিবির আয়োজন করেছে। প্রায় প্রত্যেকটি শিবিরে সক্ষমের দক্ষিণ অসম প্রান্ত সম্পাদক মিঠুন রায়, ন্যাশনাল মেডিকোস অর্গানাইজেশনের বরাক উপত্যকার সাংগঠনিক সম্পাদিকা রঞ্জনা ধর উপস্থিত থেকে দিব্যাঙ্গদের সহায়তা করেছেন। করোনা কালের প্রারম্ভে প্রায় প্রত্যেকটি বনবাসী গ্রামের লোকেদের অনুদান পৌঁছে দিতে এগিয়ে এসেছিলেন সংগঠনের কার্যকর্তারা। প্রায় প্রতিটি বনবাসী ঘরে খাদ্যসামগ্রী-সহ বিভিন্ন সহায়তা সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়।

কয়েকদিন আগে রামমন্দির নিধি সংগ্রহ অভিযানের জন্য বনবাসী গ্রামগুলিতে পৌঁছান রাষ্ট্রবাদী সংগঠনের ভাই-বোনেরা। বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক সঞ্জয় কুমার দেব চেরাগী সীমান্তবর্তী গ্রাম শর্মাপা বস্তিতে পৌঁছান। সেখান থেকে ফিরে তাঁর মন্তব্য— 'জন্মসূত্রে চেরাগীর হয়েও চেরাগী অঞ্চলের ওই গ্রামে পৌঁছতে আমার ৫০ বছর লেগে গেল। একসময় ওই গ্রামগুলিকে ব্যবহার করে বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। গত সাত-আট বছরে এটা অবশ্যই স্তিমিত হয়েছে। ওরা এখন মূল স্রোতে ফিরতে শুরু করেছে।

আমরা ত্রিপুরা, মিজোরাম, মণিপুর, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল ও অসমে এর করুণ রূপ বার বার দেখেছি। এখানকার রক্তাক্ত ইতিহাস প্রায় সবারই জানা। বনবাসীরা নিজ সংস্কৃতি আদৌ টিকিয়ে রাখতে পারবে, না কি ঔপনিবেশিক ধর্ম ব্যবসায়ীদের হাতে সব কিছু বিলিয়ে দেবে, তার জবাব দেবে সময়। আমাদের এখন নিজ ভাই-বোনদের বাঁচানোর কঠিন ব্রতকে সাধনা স্বরূপ গ্রহণ করতে হবে। তবেই সেই কঠিন বাস্তবের মোকাবিলা সম্ভব।

(লেখক ত্রিপুরার বিশিষ্ট সমাজসেবী)

শুভস্য শীঘ্রম্ , অশুভস্য কালহরণম্

সময়ের মূল্য বুঝতে লক্ষ্মণকে রাক্ষসরাজ রাবণের উপদেশটি প্রণিধানযোগ্য। রাম-রাবণের যুদ্ধে রাবণ রামের বাণে বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। রাবণ যখন মৃত্যুশয্যায়

শায়িত কিন্তু তখনও প্রাণবায়ু নির্গত হয়নি, রামচন্দ্র অনুগত প্রিয়ভাই লক্ষ্মণকে বললেন, 'ভাই লক্ষ্মণ, রাবণ অত্যন্ত জ্ঞানী। তুমি তাঁর কাছে যাও। জীবন সম্পর্কে কিছু উপদেশ নিয়ে এস।' কথাটি লক্ষ্মণের মোটেই পছন্দ হলো না, ভালো লাগল না। তাঁর মনে হয়েছিল রাবণ মহা দুরাচারী, লম্পট, পরস্ত্রী হরণকারী। সীতাকে হরণ করার জন্যই তো এত ক্লেশ, দুর্ভোগ ও যুদ্ধবিগ্রহ হলো। সেই পাপিষ্ঠ, রাক্ষস, লম্পট রাবণের কাছে আবার উপদেশ নিতে পাঠানো! কিন্তু দাদার আদেশ তো আর অমান্য করা যায় না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও শুধু আদেশ পালনের জন্যই তিনি গেলেন যেখানে রাবণ তিরবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় শায়িত রয়েছেন সেই অকুস্থলে। তিনি সেখানে পৌঁছেই একপ্রকার ক্রুদ্ধস্বরে রাবণকে বললেন — 'হে রাবণ, আপনি আমায় উপদেশ করুন।' রাবণ যেন ভ্রূক্ষেপও করলেন না। লক্ষ্মণের কথার উত্তরই দিলেন না। লক্ষ্মণও খুশি হলেন। পাপাচারী দুর্বৃত্তের কাছ থেকে উপদেশ নিতে হলো না বলে তিনি মনে মনে খুশিই হলেন। ফিরে এসে দাদাকে বললেন, 'তোমার আদেশে আমি রাবণের কাছে গিয়েছিলাম উপদেশ নিতে কিন্তু তিনি আমার কথা ভ্রূক্ষেপই করলেন না।' রামচন্দ্র বললেন, 'সে কী! তুমি তাঁকে কীভাবে প্রশ্ন করেছিলে, যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সঙ্গে প্রশ্ন করেছিলে তো? কোথায় দাঁড়িয়েছিলে তুমি?' লক্ষ্মণ বললেন তিনি রাবণের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। রামচন্দ্র বললেন, 'এভাবে কি উপদেশ লাভ করা যায়? তুমি তো জানো শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্। তুমি আবার যাও।'রামচন্দ্রের কথায় লজ্জিত হয়ে লক্ষ্মণ আবার গেলেন রাবণের কাছে। এবারে তিনি রাবণের পায়ের কাছে দাঁড়ালেন এবং তারপর নতজানু হয়ে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে বললেন— 'হে রাবণ, আপনি মহাজ্ঞানী, অনুগ্রহ করে আমায় উপদেশ দান করুন।' রাবণ প্রসন্ন হয়ে বললেন— 'হে লক্ষ্মণ, এখন আর বেশি সময় নেই। অল্প সময়ের মধ্যেই আমার প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবে। আমি তোমার মাধ্যমে জগদ্‌বাসীকে জীবন সম্পর্কে আমার শেষ উপদেশ দিয়ে যেতে চাই। তুমি মন দিয়ে শোন ঃ

আমার মনে এ জীবনে দুটি ভালো সংকল্প এসেছিল। প্রথমটি হলো, যদিও আমার লঙ্কাপুরী স্বর্ণময়, তবু আমি লক্ষ্য করছিলাম আমার কিছু প্রজারা খুবই গরিব, তাদের অন্নকষ্ট রয়েছে। আমি এও লক্ষ্য করেছিলাম আমার স্বর্ণলঙ্কার চারিদিকে বিপুল সমুদ্র। অগাধ অপরিমেয় এর জলরাশি। কিন্তু সমুদ্রের জলরাশি লবণাক্ত হওয়ায় অপেয়। আমি ঠিক করেছিলাম, এই বিপুল লবণাক্ত জলরাশিকে আমি ক্ষীর সমুদ্রে পরিণত করব। আমার যা বিদ্যা, বুদ্ধি, শক্তি, সাহস ও সামর্থ্য ছিল তাতে আমি পারতাম এই লবণ সমুদ্রকে ক্ষীরসমুদ্রে রূপান্তরিত করতে। কিন্তু আজ করি কাল করি করতে করতে এই শুভ কর্মটি করা হলো না। দ্বিতীয়ত, আমি স্বর্গ ও নরক সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছিলাম। জেনেছিলাম স্বর্গে অনন্ত সুখ আর নরকে অশেষ দুঃখ। আমি ঠিক করেছিলাম যাতে সকলে অনায়াসে স্বর্গে চলে যেতে পারে, তারজন্য পৃথিবীর সঙ্গে স্বর্গের একটি সিড়ি তৈরি করে দেব। আমার যা বুদ্ধি, বিদ্যা, সাহস, শক্তি ও সামর্থ্য ছিল তাতে আমি পারতাম পৃথিবীর সঙ্গে স্বর্গের সিড়িটি তৈরি করতে কিন্তু আজ করি কাল করি করতে করতে আর করা হলো না। অন্যদিকে আমার মনে একটি কুচিন্তা প্রবেশ করেছিল— সীতা হরণ করতে হবে। আর সঙ্গে সঙ্গে আমি সেই কুকর্মে লিপ্ত হয়ে গেলাম। তাই আজ দেখ, তোমাদের বাণে আমার প্রাণবায়ু নির্গত হচ্ছে। তোমার মাধ্যমে আমি জগদ্‌বাসীকে উপদেশ দিয়ে যেতে চাই— শুভস্য শীঘ্রম্, অশুভস্য কালহরণম্। যেকোনো শুভ সংকল্প কারো মনে এলে তা যেন শীঘ্র সম্পাদন করা হয়, আর অশুভ সংকল্প মনে এলে অপেক্ষা করা হয় বা মোটেই না করা হয়। অশুভ কর্মের অনুষ্ঠান করার অর্থই হলো আত্মঘাতী কাজ করা। অপরদিকে শুভকর্ম করার অর্থ হলো আত্মত্রাণ। সময় সম্পর্কে এই মূল্যবোধ থাকলে আমাদের জীবন সফল হয়, ধন্য হয়। আর এই বোধ না থাকলে জীবন ব্যর্থ হয়ে যায়।

(স্বামী জ্ঞানলোকানন্দের 'মূল্যবোধে ধন্য জীবন' থেকে)

ভারতের পথে পথে

জম্মু

প্রাচীন জাম্বু রাজার প্রতিষ্ঠিত জাম্বুনগর কালে কালে হয়েছে জম্মু। জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের ডোগরাদের শীতকালীন রাজধানী জম্মু। সমতল ও পাহাড়ের সমন্বয় সমন্বয় ঘটেছে এখানে। বাণিজ্য নগর হিসবে প্রসিদ্ধ হলেও শ্রীনগরের তোরণদ্বার রূপে জম্মুর প্রসিদ্ধি। মন্দির ও দুর্গের দেশও বলা হয় জম্মুকে। তাওয়াই ও চন্দ্রভাগা দুই নদী জম্মুকে ঘিরে বয়ে চলেছে। শহর থেকে চার কিলোমিটার দূরে তাওয়াই নদীর বাম পাড়ে পাহাড়ের উপরে ডোগরা রাজা বালুলোচনের নির্মিত দুর্গ। উত্তরে রয়েছে রামনগর দুর্গ। শহরে রয়েছে ডোগরা আর্ট মিউজিয়ম, অন্দরমহল প্রাসাদ, রঘুনাথ মন্দির, রামবীরেশ্বর মন্দির। দুঃখের বিষয়, জম্মু-কাশ্মীরের এক-তৃতীয়াংশ রয়েছে পাকিস্তানের দখলে।

জানো কি?

কোন পত্রিকা কে সম্পাদনা করতেন

- প্রবাসী– রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।
- ভারতবর্ষ–জলধর সেন ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।
- সমাচার চন্দ্রিকা--ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
- বঙ্গদূত – নীলমণি হালদার।
- ভারতী– স্বর্ণকুমারী দেবী।
- বান্ধব– কালীপ্রসন্ন ঘোষ।
- সাধনা– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- পূর্ণিমা– বিহারীলাল চক্রবর্তী।
- সাহিত্য – সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
- ধূমকেতু – কাজী নজরুল ইসলাম।

ভালো কথা

গালিগালাজ নয়

আমাদের গ্রামের শ্যামল জেঠুকে আমাদের গ্রাম ছাড়াও আশেপাশের গ্রামের সবাই মানে। গ্রামের বড়োদের সঙ্গে আলোচনা করে জেঠু সব দলের নেতাদের বলেছেন গ্রামে ভোট প্রচারে এসে কারো বিরুদ্ধে কোনো দোষারোপ করা চলবে না। শুধু তাদের দল ভোটে জিতলে গ্রামের বা রাজ্যের কী কী উন্নয়ন করবে তা-ই বলতে হবে। আমাদের গ্রামের যারা বিভিন্ন দল করে তাদেরও কারো বিরুদ্ধে কিছু বলতে নিষেধ করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত দুটি দল আমাদের গ্রামে সভা করেছে। জেঠুর শর্ত মেনে তারা কেউ অন্য দলকে গালিগালাজ করেনি। আমার বন্ধু রঞ্জু বলছিল সারা দেশে যদি এরকমই হতো তাহলে কোনো অশান্তি হতো না।

অপর্ণা ঘোষ, দ্বাদশ শ্রেণী, কোটশিলা, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

ভোটের বাদ্যি

অরবিন্দ কুমার, একাদশ শ্রেণী, আড়ষা, পুরুলিয়া।

ভোটের বাদ্যি বেজে গেছে
নেতার মন নেচে উঠেছে
কুকথার ফুলঝুরি ছুটেছে।
ভোটকর্মীরা ভয়ে কাঁপছে
মানুষজনও ভয়ে আছে
কী যে হয় সবাই ভাবছে।

কেউ বলছে ভয় নাই এবার
কড়া কমিশন এসেছে আবার
গণ্ডগোল করবে সাধ্য কার বাবার?
ঠাম্মা বলে ভোট যদি নাই-বা হতো!
এমন কি কিছু ক্ষতি হতো
কত প্রাণ বেঁচে যেত।

কবিতা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

শব্দরূপ-১০ (অনির্দিষ্ট) **অরুণ কুমার ঘোড়ই**

১	২	■	■	৩		৪	৫
■	৬		৭		■	৮	
৯		■	১০		১১	■	
১২		১৩		■	১৪	১৫	■
■	১৬		■	১৭			১৮
১৯	■	২০	২১		■	২২	
২৩	২৪	■	২৫				■
২৬				■	■	২৭	

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. বন অথবা আগুন—সবই।
৩. মা-মাটির স্বদেশ পাবি। **৬.** নরবলির সেই যজ্ঞটি।
৮. গাছের পাতায় লেখার চিঠি। **৯.** সাপ রয়েছে দুটি ঘরে।
১০. দিনের বেলা চিনবে তারে।
১১. যদি বলি 'পদ্মিনী'-এ।
১৪. ঘরটি ভরো 'ব্রাহ্মণ' দিয়ে।
১৬. আঙুলের ডগায় শক্ত ফলা।
১৭. 'যাওয়া-আসা'—যায় তো বলা।
২০. ধর্ম-উপাসনা—মুসলমানের।
২৩. গ্রিস দেশেতে এই নগরী। **২৫.** বিমর্ষভাব—কী আর করি!
২৬. দ্যুতক্রীড়া—সহজ কথায়। **২৭.** জড়ানো চুল—সাধুর মাথায়।

উপর-নীচ : ২. 'অরণ্য যাত্রা'য় উত্তর পাবে।
৩. 'কৃষ্ণ' ছাড়া আর কী হবে।
৪. পৃথিবী-পতি, আসলে রাজা।
৫. 'বন্ধুত্ব' চাই—উত্তর সোজা।
৭. খুঁজে খুঁজে 'পৃথিবী সোজা।
৯. পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের এ এক জেনো।
১১. একেই নাকি সূর্য কয়!
১৩. লিপিকরণ, লিখিত বিষয়।
১৫. বারাণসীর নতুন যে নাম।
১৭. পৌরহিত্য, ধর্ম ব্যাখ্যান।
১৮. 'তথাপি' বলছি, বুঝলে না কি?
১৯. সম্মান, পুরস্কার-মাথায় রাখি।
২১. 'মোকর্দমা' হয় বিবাদে-রাগে।
২৪. কামড়ায় খুব, ধোঁয়ায় ভাগে।

(● আগামী সংখ্যায় সঠিক উত্তরদাতাদের নাম প্রকাশ করা হবে।)

প্রেরণার পাথেয়

সংগঠনের মধ্যে এক ব্যক্তি অপরের সহিত বৃথা বাক্যব্যয় করে না। নিজে কাজ করিতে থাকে। যেখানে কথাবার্তা বেশি হয়, ধরিয়া লইতে হইবে সেখানে কাজ হইতেছে না। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক কথা কম বলে। তাহার হইয়া তাহার অন্তঃকরণ কথা বলে। তাহাদের ভাষা হৃদয়ের ভাষা এবং তাহারা একে অপরের দিকে দেখিয়াই কাজ করিয়া যাইতে পারে। কেবল পরস্পরের দিকে দৃষ্টপাত করিয়াই তাহারা একে অপরকে নিজের কথা বুঝাইয়া দিতে পারে।

* * *

হিন্দু সংস্কৃতি রক্ষা করিবার জন্য বলশালী সংগঠন তৈয়ারি করিতে হইবে। তাহার অর্থ অবশ্য কেবল সংখ্যা বাড়ানো নয়। সঙ্ঘের বাড়ানো নয়। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের মধ্যে এই আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করা প্রয়োজন যে আমরা এই কাজ অবশ্যই করিতে পারিব।

* * *

হিন্দু সমাজ এত শক্তি ও এরূপ সংগঠন সৃষ্টি করিতে চায় যাহাতে যে সব বিদেশি আজ আমাদের হিন্দুস্থানে রহিয়াছে বা ভবিষ্যতে যাহারা এখানে আসিবার ইচ্ছা রাখে তাহারা কেহই হিন্দুর মাতায় চড়িয়া বসিবার দুঃসাহস না করে।

* * *

হিন্দু জাতির সুখেই আমার ও আমার আত্মীয় স্বজনের সুখ, হিন্দু জাতির উপর যে কোনো সংকট আসুক না কেন তাহা আমাদের সকলের পক্ষেই সমান বিপদের কথা এবং হিন্দুজাতির অপমান আমাদের সকলের অপমান—এই সৌহার্দ্যের মনোভাব সমস্ত হিন্দুর মনে থাকা উচিত। ইহাই রাষ্ট্র-ধর্মের মূলমন্ত্র।

* * *

নিজের দেশ ও সমাজ ছাড়া অন্য কোনো মোহ নাই, নিজের ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো কিছুর আকাঙ্ক্ষা নাই, হিন্দু ধর্মের শক্তিবৃদ্ধি হইয়া হিন্দু-রাষ্ট্রের প্রতাপসূর্য তেজস্বী হউক—ইহা ছাড়া যাহার অন্য কোনো স্বার্থ-লালসা নাই সেই ব্যক্তির মনে ভয়, চিন্তা বা নিরুৎসাহের সঞ্চার এই পৃথিবীতে কেহ করিতে পারিবে না।

* * *

সঙ্ঘের কাজকে কি আমরা মনে-প্রাণে ভালোবাসি? দিনরাত সঙ্ঘের কাজের নেশা কি আমাদের পাইয়া বসিয়াছে? এই কাজের প্রতি আমাদের মনে সত্যিকারের মমত্ব সৃষ্টি হইয়াছে কি? এ কাজ ছাড়া আমাদের আর কোনো কিছু কী ভালো লাগে না? চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কত ঘণ্টা আমরা সঙ্ঘের প্রত্যক্ষ কাজ বা সঙ্ঘ সম্বন্ধীয় চিন্তায় ব্যয় করি?

* * *

প্রতিকূল পরিস্থিতির দিকে না তাকাইয়া যে কেবল কাজ করিয়া যায় সেই বিজয়ী হয় এবং পৃথিবীতে তাহারই নাম হয়। আর তোমাদের ভয় পাইবার কী আছে? আমাদের কাজ ঐশ্বরীয় কাজ। তাই ভগবান ও মহাপুরুষদের আশীর্বাদ আমাদের উপর আছে।

('ডাক্তারজীর বাণী' পুস্তিকা থেকে গৃহীত)